আরও বাড়াইয়া দিতেছ। আমরা ঈশ্বরকে ত সৌন্দর্য্যপ্রিয় জ্ঞানময় এবং মঙ্গলময় বলিয়া জানি। তবে তাঁহার এরূপ স্বকৃত সৌন্দর্য্য বিনাশের ইচ্ছা হইতেছে কেন? কত শক্তি ব্যয় ক'রে সুন্দর বস্তুটী রচনা কল্লেন, আবার তাহা বিনাশের জন্য শক্তিক্ষয় কচ্ছেন কেন? তুমি বলছ এ জ্ঞানময় ঈশ্বরের ইচ্ছা-প্রসূত। নিরীশ্বরবাদী এতাদৃশ সৃষ্টি ও সংহার ক্রিয়া দেখিয়া কি উহা বালকের খেয়াল মনে কর্ত্তে পারে না? বালক যেমন খেয়ালে পুতুলটী গড়ে এবং খেয়ালে পুতুলটী ভাঙ্গে, কোনও উদ্দেশ্য থাকে না, বিশ্ব-রচনা ও ভঙ্গ করা কি তদ্রূপ খেয়ালের কার্য্য নয়?

যোগী। আমরা অন্য উপায়ে যদি ঈশ্বরের স্বরূপ না জান্‌তাম, কেবল কার্য্য কারণ বিচার ক'রে যদি ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণীত হ'ত, তা হলে নিরীশ্বরবাদীর সিদ্ধান্তই ঠিক্ হ'ত। জগতের দুই চারিটী কার্য্য দেখিয়া বিচার কল্লে জগৎ-রচয়িতার জ্ঞান প্রমাণিত না হইয়া বরং অজ্ঞান ও অন্ধতাই প্রমাণিত হয়। তুমি যে সৌন্দর্য্যের কথা বলছ সে সৌন্দর্য্য কি? সৌন্দর্য্য পরিমাণ করিবার কি কোন সাধারণ ব্যবস্থা আছে? যাহা তোমার নিকট সুন্দর, তাহা অপরের নিকট সুন্দর নহে।

সুধা। ভাল, গোলাপ ফুলটি যে সুন্দর, সে বিষয়ে কি দুটী মত আছে? এমন কি কোন মানুষ আছে যে গোলাপকে কুৎসিত বলবে?

যোগী। কোন কোন বিষয়ে মানব সকল একমত হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর যে মানব-মনের সহিত মত মিলাইয়া গোলাপকে সুন্দর বল্‌বেন, তার প্রমাণ কি?

সুধা। তিনি যে বলবেন না, তার প্রমাণ কি কিছু আছে?

যোগী। বস্তু ও গুণসমূহের সুশৃঙ্খল সমাবেশই সৌন্দর্য্যবোধের জনক। তুমি পাঁচটি বস্তু কিম্বা পাঁচটি ফুলের সুশৃঙ্খল সমাবেশ দেখিয়া গোলাপকে সুন্দর বলিতেছ, ঈশ্বর অনন্ত ভূত এবং অনন্ত ভবিষ্যতের সহিত মিলাইয়া গোলাপের বিচার করিতেছেন, সুতরাং এক সময়ে গোলাপের অস্তিত্ব শোভাবৃদ্ধির কারণ হইলেও অন্য সময়ে তাহার অস্তিত্ব শৃঙ্খলার বাহিরে পড়ে বলিয়া শোভা নাশের কারণ হয়, এজন্য তাহার রক্ষা অপেক্ষা বিনাশ দ্বারাই সৌন্দর্য্য বজায় থাকিতেছে। তোমার দৃষ্টিশক্তি সীমা-বদ্ধ বলিয়া গোলাপের অস্তিত্বকে এক সময়ে শৃঙ্খলার বহির্ভূত মনে করিতে পারিতেছ না।

সুধা। আপনি যাহা বলিলেন তদ্দ্বারা কেবল সম্ভাবনাই প্রমাণ হয়। কিন্তু ঈশ্বর যে গোলাপটীকে শৃঙ্খলার বহির্ভূত মনে করিয়া তুলিয়া লইতেছেন, তাহার নিশ্চয়তা কি?

যোগী। আমি ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যদি আমরা ঈশ্বরের স্বরূপ অন্য উপায়ে না জানিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়

করিয়া কিছু বলিতে পারিতাম না। ঈশ্বরকে জ্ঞানময় কর্ত্তারূপে জানি বলিয়াই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, তিনি যাহা শৃঙ্খলার বাহিরে পড়িতেছে, তাহাই তুলিয়া ফেলিতেছেন।

সুধা। আপনি বল্লেন ঈশ্বরের স্বরূপ অন্য উপায়ে জানিয়াছেন। সে উপায় কি?

যোগী। সে উপায় আপ্ত বাক্য।

সুধা। ওমা! এ যে একটা ফারসী কথার মত বোধ হয়।

যোগী। তুমি কি এ কথা কখনও শুন নাই? হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র সকল আপ্ত বাক্য সূত্রে প্রাপ্ত; এ কথা কি তুমি জান না?

সুধা। এমন কথা শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আপনি ব্যাখ্যা করিয়া বলুন।

যোগী। ঈশ্বর ভক্তের নিকট আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং কখন কখন জীবের কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দেন। ইহাই অবশেষে শাস্ত্রে লিখিত হইয়া থাকে। হিন্দুর বেদ, মুসলমানের কোরাণ এবং খ্রীষ্টানের বাইবেল এইরূপ আপ্ত বাক্য সূত্রে প্রাপ্ত।

সুধা। আপনি বল্লেন, ঈশ্বর ভক্তের নিকট আত্মস্বরূপ ও কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রকাশ করেন, তবে অভক্তের উপায়? আর ভজনা কর্ত্তে কর্ত্তেই না ভক্ত হয়? সুতরাং ভক্তকে ভক্ত হইবার পূর্ব্বেই ভজনা কর্ত্তে হবে অথচ ভক্ত না হলে যদি ঈশ্বরের স্বরূপ এবং ভজনার উপায় জানিতে পারা না যায়, তাহা হলে ভজনা হবে কিরূপে?

যোগী। মানবের মনে তাহার অতিরিক্ত কোন শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস স্বাভাবিক; এবং সে শক্তির সন্তুষ্টির এবং অসন্তুষ্টির উপর তাহার মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে, এ বিশ্বাসও স্বাভাবিক। বর্ত্তমান অসভ্য জাতির ধর্ম্মবিশ্বাস আলোচনা করিলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং যে শক্তির সন্তুষ্টির উপর মানবের মঙ্গল নির্ভর করে, সে শক্তিকে সন্তুষ্ট করিবার বাসনাও মানবমনে স্বতঃই উদিত হয়। প্রথমতঃ মানুষ যাহাতে নিজে সন্তুষ্ট হয়, তদ্দ্বারাই আপনার অতীত শক্তিকে সন্তুষ্ট করিতে প্রয়াসী হইয়া থাকে। এ স্থলেই ভজনার সূত্রপাত। এই স্বাভাবিক ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে করিতে যাহার চিত্ত একটু পবিত্র ও উন্নত হয়, তাহাকেই ভক্ত আখ্যায়িকা প্রদত্ত হয়। প্রথম এতাদৃশ লোকের চিত্তেই ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিফলিত এবং ব্রহ্মবাণী শ্রুত হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট অধিকারের ব্যক্তিগণ অর্থাৎ অভক্তগণ ইহাদিগের নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করে, এবং ক্রমশঃ ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয়। ক্রমে মানবসমাজ যতই উন্নত হয়, ততই জনসাধারণের মনে ব্রহ্ম স্বরূপ প্রকাশিত এবং ব্রহ্মবাণী শ্রুত হইয়া থাকে। এখন বুঝিলেত?

সুধা। আপনার নিকট আজ বহুমূল্য ধন পাইলাম। আমার বহুদিনের

সন্দেহ দূর হইল। আমি সময় সময় আপনার নিকট অসিয়া এইরূপ উপদেশ গ্রহণে জীবন সার্থক করিব।

যোগী। তুমি যখন সুবিধা পাইবে, তখনই আসিবে। ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতে পারিলে আমার বড় আনন্দ হয়, কিন্তু আমার নিকট বহু লোকে সংসারের কামনা লইয়াই আসিয়া থাকে। তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় সময় বৃথা নষ্ট হয়। তোমার মত ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসুর সহিত আলাপে সময় সার্থক হয়।

অতঃপর সুধাময়ী যোগি-প্রবরের চরণে প্রণাম করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন। এক দর্পণে মুখ দর্শন তাঁহার অমূল্য জ্ঞানলাভের সোপান হইল। সংসারে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বন করিয়া মহৎ ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। যাঁহাদিগের সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি আছে, তাঁহারা উহা ভাবিয়া অবাক্ হইয়া যান। প্রত্যেক নরনারী যদি সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তাশীল ও সচেতন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অনেক অমূল্য নিধি লাভ করিতে সমর্থ হন। জ্ঞানরত্নের কাছে সংসারের রাজ্যসম্পদও তুচ্ছ পদার্থ।

রুষীয় সম্রাটের রাজ্যাভিষেক।

রুষীয় মহারাজ্যের বিবরণ গত বৈশাখের বামাবোধিনীতে প্রদত্ত হইয়াছে। পৃথিবীতে এত বড় রাজ্য আর নাই। ইহা পুরাতন মহাদ্বীপের প্রায় অর্দ্ধাংশ। গত মাসে সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস এই মহারাজ্যের মহাসিংহাসনে সমারোহে অভিষিক্ত হন। ইহাঁর পিতামহ প্রথম নিকোলাস এক প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন, কিন্তু রাজদ্রোহীদিগের গূঢ় কৌশলে রাজপথে গাড়ী হাঁকাইয়া যাইতে যাইতে হত হন। ইহাঁর পিতা ২য় আলেকজাণ্ডার 'ভীম কান্ত' উভয়গুণসম্পন্ন ছিলেন এবং প্রজাদিগের অধিকতর প্রিয় হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় নিকোলাস একজন সদ্‌গুণসম্পন্ন যুবাপুরুষ। কয়েক বৎসর হইল ইনি যেরূপ সামান্য বেশে আসিয়া ভারত ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকের স্মরণ আছে। ইহাঁর বিবাহের আয়োজন হইতে হইতে পিতার মৃত্যু হয়, এই জন্য বিনা আড়ম্বরে বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এক বৎসরের পর তাঁহার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান যথারীতি সম্পন্ন হইল। এই উপলক্ষে তিনি একটী সুন্দর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে বামাবোধিনীতে চীন সম্রাটের প্রার্থনা প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে যেমন ভক্তি, বিনয় ও দায়িত্ববোধ প্রভৃতি আছে, ইহাতেও সেইরূপ। ভূপতিগণ রাজার রাজা বিশ্বরাজের চরণাশ্রিত হইয়া শাসনভার গ্রহণ করিলে প্রকৃত রাজধর্ম্ম

পালনের উপযুক্ত হন। রুষীয় সম্রাটের প্রার্থনার মর্ম্ম এই :—

"হে ঈশ্বর! তুমি স্বয়ং আমাকে তোমার এই লোকমণ্ডলীর শাসনকর্ত্তা ও বিচারকরূপে মনোনীত করিয়াছ। আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছ, তদ্বিষয়ে আমাকে শিক্ষা দাও। আমার গন্তব্য পথ তোমার আলোকে আলোকিত কর এবং অবলম্বিত গুরুতর পরিচর্য্যাব্রত কিরূপে সম্পন্ন করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া দেও, যেন মহাবিচার-দিনে তোমার নিকট দণ্ডার্হ না হই, আমার কার্য্যের উপযুক্ত হিসাব দিতে পারি।"

মস্কৌ মহানগরের যে ধর্ম্মমন্দিরে সম্রাটের অভিষেক হইয়াছে, তাহা ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ চারি শত বৎসরের অধিক হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে এক বৃহৎ ঘণ্টা আছে, তাহা ওজনে ৮৮৭৷৷০ মণ, তাহার পরিধি ৪৬ ও ঊর্দ্ধাধঃপরিমাণ ১৪ হাত। ১৭৩৩ সালে যখন ইহা গঠিত হয়, শুনা যায় অনেক মহিলা আপনাপন অলঙ্কার খুলিয়া গলিত কাঁসায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন, ইহাতে ঘণ্টাটী নানা ধাতুময় হইয়াছে। সম্রাটের অভিষেক-সময়ে ঘোর ঘটায় এই ঘণ্টাধ্বনি হইয়াছিল!!

সুখ ও দুঃখ।

এ সংসারে সুখ নামে কোন পদার্থ নাই। জগতে প্রকৃত সুখী কে? সকলের হৃদয়ের অভ্যন্তরেই কোন না কোন দুঃখ আছে, কারণ প্রকৃত সুখ এ নশ্বর সংসারের নয়।

যদি কেহ কখন প্রকৃত সুখের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবু তিনি বলিতে পারিবেন না যে, নির্ব্বিকার নিশ্চিন্ত মনে সেই সুখ উপভোগ করিয়াছেন, কেননা তখনও ভাবী দুঃখের আশঙ্কা তাঁহার সেই বিমল সুখকে কলঙ্কিত করিয়াছে। তাই বলি, সংসারে সুখ নামে কোন পদার্থ নাই।

আজ পতিগতপ্রাণা সাধ্বী পতির করুণ হৃদয়ে মুখ লুকাইয়া জীবনের সমস্ত আলা যন্ত্রণা জুড়াইতেছেন, কিন্তু তখনই কি তিনি প্রকৃত সুখী? ভাবী বিরহ চিন্তায়, বা যদি কখন এমন হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হয় সেই আশঙ্কায় তাঁহার সুখোদ্দীপ্ত হৃদয়কে মলিন করিতেছে।

আবার স্নেহময়ী জননী প্রাণের পুতলি শিশুর মুখকমল দর্শন করিয়া কত তৃপ্ত হইতেছেন, বার বার সেই মুখে অজস্র স্নেহমাখা চুম্বন বর্ষণ করিতেছেন, হৃদয়ের ধনকে হৃদয়ে চাপিয়া ধরিতেছেন, কিন্তু তখনই কি তিনি প্রকৃত সুখী? না, কখনই নয়, তখনও সেই প্রাণাধিক ধনের অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে! তাই বলি, সংসারে সুখ নাই, সাংসারিক বিষয়ে মগ্ন হইয়া

কেহ কখন সুখী হইতে পারে নাই, পারিবেও না।

অপরে হয়ত অনেক সময় ভাবে "অমুক কেমন সুখী!" কিন্তু বাস্তবিক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে তাহারও অন্তর হইতে দুঃখ বাহির হইয়া পড়িবে।

তবে যাঁহারা সাংসারিক নহেন, শুধু পরমার্থ চিন্তাই যাঁহাদের জীবনের ব্রত, তাঁহারাই প্রকৃত সুখী। সাংসারিক নিয়মে কখনই তাঁহাদিগকে ক্লিষ্ট ও মলিন করিতে পারিবে না। অনন্ত অচিন্ত্য ভগবানের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন, তাই তুচ্ছ সংসার তাঁহাদিগের করায়ত্ত, তাই এই অকিঞ্চিৎকর পদার্থে তাঁহাদের সেই অটল অচল হৃদয়ের কোনই পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে না।

অন্য দিকে সুখ দুঃখ ভগবানের দান, ইহা সকলেই জানেন; কিন্তু কয়জন তাঁহার সমস্ত দান প্রীতির সহিত গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন? তিনি যাহা দান করেন, তাহাই অমূল্য। তবে আমরা অধম, তাই সেই সত্য সনাতনের স্নেহের দান প্রফুল্লমনে গ্রহণ করিতে পারি না। তিনি যাহা করিতেছেন, সবই আমাদের মঙ্গলের জন্য, কিন্তু সব সময়, সব অবস্থায় কয় জনে ধীরভাবে এ কথা ভাবিয়া থাকেন?

আমরা সুখ পাইলে, যিনি সেই সুখের প্রদাতা তাঁহাকে ভুলিয়া তুচ্ছ সুখে আত্মহারা হই, তাঁহার দত্ত ধনে ধনী হইয়া আবার তাঁহারই অবমাননা করি, তাই তিনি দুঃখ দেন। যখন বড় সুখে মত্ত হইয়া বিপথে যাই, তখনই দুঃখ আসিয়া আমাদিগকে বাধা প্রদান করে। দুঃখের সময় সেই সর্ব্বদুঃখহারীকে মনে পড়ে, দুঃখে অকৃত্রিম ভক্তির সহিত আরাধ্য দেবতার—জগৎপাতা জগদীশ্বরের আরাধনা করি, তখন হৃদয় প্রকৃত নির্ম্মল ও নিষ্পাপ হইতে থাকে। কিন্তু সেই দুঃখ যদি আবার দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয়, তবে পুনরায় তাঁহার আরাধনা পরিত্যাগপূর্ব্বক পাপী আমরা তাঁহার উপর দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত হই—বুঝি না বা বুঝিতে চাহি না যে, আমাদের বড় সুখের, বড় চাঞ্চল্যের পরিণাম ফল স্বরূপ এই অবশ্যম্ভাবী দুঃখ। ইহাতে তাঁহার কোনই অপরাধ নাই, অপরাধ আমাদেরই।

যিনি আমাদের সুখের জন্য এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, সুন্দর হৃদয়মুগ্ধকারী পত্র, পুষ্প, বিটপী, ব্রততী রচনা করিয়াছেন, ধরণী শস্যশ্যামলা ও নদ-নদীভূষিতা করিয়াছেন, বিনা কারণে আমাদিগকে দুঃখ দেওয়া কখনই তাঁহার অভিলষিত হইতে পারে না। আমরা তাঁহার নিয়মের ব্যতিক্রমপূর্ব্বক তাহার ফলস্বরূপ ক্লেশভোগ করি, আবার না বুঝিয়া সর্ব্বতাপহারী জগজ্জীবন দয়াময়কে দোষী করি, কি ভ্রান্তি!

কিন্তু ভ্রান্ত নয় কে? ভ্রান্তি মানবমাত্রেরই স্বভাব। বড় দুঃখে পড়িয়া যখন তাহার কূল কিনারা দেখিতে পাই

না, তখনইত বলি "দয়াময় এই কি তোমার দয়া ?" কিন্তু জানি না যে তিনি ইচ্ছা করিয়া কখনও কাহাকে কষ্ট দেন না। তিনি বিচারক, সুবিচার তাঁহাকে করিতেই হইবে, তাই হাজার দয়ালু হইলেও সেই সময় আমাদের কষ্ট প্রশমন করিবার শক্তি তাঁহারও নাই। তবু সেই অবস্থার মধ্যেও তিনি আশা-বারি সিঞ্চনে আমাদের দগ্ধমরু প্রাণকে সজীব, সুশীতল ও আশ্বাসিত করেন। আমরা মূঢ়, সেই ভূতভাবন জগৎ-পতির স্বভাব সামান্য মানব-চরিত্ররূপে ধারণা করিয়া আপনা আপনি ক্লেশ ভোগ করি।

অপরাধী সন্তানকে জনক জননীও কঠোর শাসন করিয়া থাকেন, তাহাতে আমাদের অপেক্ষা বরং তাঁহারাই অধিক মনঃকষ্ট পাইয়া থাকেন। কে জানে বিশ্বজননীও আমাদিগকে নিয়মের অনুরোধে শাসন করিয়া সেইরূপ কষ্ট ভোগ করেন কি না? যাঁহার অসীম অনন্ত স্নেহের কণিকামাত্র পাইয়া সংসারের জনক জননী এত স্নেহময়, সেই প্রেম-পারাবারের হৃদয়ে আমাদের জন্য কত প্রেম রহিয়াছে, তাহা কি ক্ষুদ্র মনে আমরা ধারণা করিতে সক্ষম ?

তবে মাঝে মাঝে পুণ্যাত্মা ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগকে দুঃখ ভোগ করিতে দেখা যায় কেন? এইত বিষম সমস্যা !! জানি না, কেন অনেক স্থলে তাঁহারা অত্যন্ত যাতনা পাইয়া থাকেন; আবার পক্ষান্তরে জগৎবিখ্যাত মহাপাপীদিগকে নির্ব্বিরোধ সুখভোগ করিতে দেখা যায়, ইহার কারণ নির্ণয় করিতে অদ্যাবধি কেহ পারে নাই।

কেন, কি উদ্দেশ্যে ভগবান্ কি কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা অল্পবুদ্ধি মানবে কি বুঝিবে? তিনি যতটুকু বুঝিবার ক্ষমতা দেন, আমরা ততটুকু বুঝিতে পারি, কেন সব বুঝান না, তাহা তিনিই জানেন।

অনেক সময় অনেকে বলিয়া থাকেন যে, বিধাতা ধার্ম্মিক লোকদিগকে অযথা ক্লেশ দিয়া তাঁহাদের ভক্তি ও বিশ্বাসের পরীক্ষা করেন, আবার পাপীদিগকে ইহ জন্মে সুখ দিয়া পর জন্মে কঠিনতর শাস্তির জন্য প্রস্তুত করেন। কেহ ইহার যথার্থ কারণ নির্ণয় করিতে পারে নাই, ইহা সত্য কি মিথ্যা কে বলিবে? পরলোক আছে, কি না আছে, তাহাও কেহ জানে না, সমস্তই অনুমান। তবে কিনা এক বিষয়ে দেখা যায় যে, ধার্ম্মিকগণ হাজার কষ্টে পতিত হইলেও কর্ত্তব্য-পালন, ঈশ্বরচিন্তা ও ঈশ্বরে নির্ভর তাঁহাদিগের চিত্তে বিমল সুখ শান্তি আনয়ন করিয়া দেয়, কিছুতেই তাঁহারা কর্ত্তব্য-পথ হইতে ভ্রষ্ট হন না। পাপীর অনুতাপ কি ভীষণ তাহাও সকলেই জানেন। তাহারা ঘটনাক্রমে সাংসারিক সুখের অধিকারী হইলেও নানা কষ্ট যন্ত্রণা ও দুশ্চিন্তা ভোগ করিয়া থাকে। তাহাদের সে সুখ ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়।

এখন দেখা যাক্ সুখী কারা? শুধু

ধার্ম্মিকেরাই যথার্থ সুখী, আর কেহই সুখী নয়। যাহাদের সুখ সদা সর্ব্বদা সন্দেহ-বাত্যায় দোদুল্যমান থাকে, তাহারা কখনই সুখী হইতে পারে না।

এখন সুখের কথা যাউক। দুঃখ কি? তাহা প্রাণিমাত্রেই অবগত আছে। তাহার হাত এড়াইবার ক্ষমতা কাহারই নাই। ললাট-লিখন—অদৃষ্টলিপির নাম করিয়া সকলেই দুঃখ সহ্য করিয়া থাকে, তবু তাহার তীব্রতা হইলেই হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া যায়। সন্তোষের সহিত ঈশ্বরের সব দান গ্রহণ করা কি সাধারণ লোকের কাজ? পতিশোক, পুত্রশোক, কে বিধাতার করুণার দান বলিয়া গ্রহণ করিবে? কে ইহা বিশ্বাস করিতে পারে? সমস্তই এইরূপ। আমরা মানব, যাহাদিগকে ভালবাসি, তাহাদিগকে সুখী করিতে আমাদের একান্ত অভিলাষ। ঈশ্বরকেও সেইরূপ ভাবি; কারণ তাঁহার সামান্য আভাস লইয়াইত মানবের জন্ম, তাঁহার দত্ত জ্ঞানেই তাহারা জ্ঞানী। ইহাতে আমাদের বেশী কি দোষ? তবে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, তাঁহার কার্য্যকলাপ, তাঁহার ইচ্ছা অনিচ্ছা, তাঁহার অবিচার সুবিচার বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। সুখও যেমন ক্ষণস্থায়ী, দুঃখও সেইরূপ, "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ"—সুখ দুঃখ চক্রের মত পরিবর্ত্তিত হয়। তাই হতাশ না হইয়া এস আমরা ভ্রাতা ভগিনী সকলে বিশ্বাসের সহিত ঈশ্বরের চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার দান সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হই।

শ্রীকুসুমকুমারী রায়।

গো-পরিচর্য্যা।

(৩৭৬ সংখ্যা—১৫ পৃষ্ঠার পর)

গো-দুগ্ধ—কৃষ্ণবর্ণ গাভীর দুগ্ধের গুণ বায়ুনাশক ও অতিশয় উপকারী। পীতবর্ণ গাভীর দুগ্ধ পিত্ত ও বায়ুনাশক। শুক্লবর্ণ গাভীর দুগ্ধের গুণ কফকারক ও গুরুপাক। বালবৎসা বা বৎসহীনা গাভীর দুগ্ধের গুণ ত্রিদোষনাশক। অনেক দিনের প্রসূতা গাভীর দুগ্ধের গুণ ত্রিদোষনাশক, তৃপ্তিকারক, ও অতিশয় বলকারী। ধবলীই হউক বা কৃষ্ণই হউক, যে গাভী ও তাহার বাছুরের বর্ণ এক, তাহার দুগ্ধ ভাল।

গো-দুগ্ধের গুণ—পথ্য, অত্যন্ত রুচিকর, স্বাদু, স্নিগ্ধ ও আয়ুর্ব্বর্দ্ধক। ইহা পিত্ত, ত্রিদোষ, হৃদ্রোগ, বিষ ও রক্তবিকারনাশক। আর ইহা পবিত্র, এবং কান্তি, প্রজ্ঞা, অঙ্গপুষ্টি ও বীর্য্য বৃদ্ধিকর।

দুগ্ধ হইতে দধি, ঘোল, ছানা, নবনীত,

ঘৃত ও নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্রত্যূষকালের দুগ্ধ গুরু, বিষ্টম্ভনামক-রোগজনক ও দুর্জর অর্থাৎ শীঘ্র জীর্ণ হয় না। এই কারণে সূর্য্য উদয়ের এক প্রহর পরে দুগ্ধ দোহন করিবে। ইহা পথ্য, দীপন, ও লঘু। গোদুগ্ধ-ফেণ খাইলে গ্রহণী রোগের প্রতীকার হয়, এবং মস্তকের ব্রহ্মরন্ধ্রে ঘর্ষণ করিলে শিরোরোগ নাশ হয়।

দধির গুণ—অতি পবিত্র, স্নিগ্ধ, বলকারী, মিষ্ট, অরুচি ও বাতজনিত পীড়ানাশক এবং মলগ্রাহী।

মাখন বা নবনীতের গুণ—ঠাণ্ডা; বর্ণ, বল, শুক্র, কফ, রুচি, কান্তি ও পুষ্টিকর, চক্ষুর হিতকর; বাত, শূল, কাস, শ্রান্তি ও সর্দ্দি দোষনাশক।

ঘৃত—মেদ, বুদ্ধি, অগ্নি, শুক্র, স্মৃতি ও কফকারী। বাত, পিত্ত, বিষ উন্মাদ, শোথ ও জ্বরনাশক।

গোমাংস—ইহার গুণ শ্বাস, কাশ, প্রতিশ্যায় (পীনাস রোগ), বিষম জ্বর, ক্ষয়রোগ ও বায়ু নাশক। ইহা শীত-প্রধান দেশে শ্রমজীবীদিগের পক্ষে বিশেষ হিতকর। উষ্ণপ্রধান দেশে নিয়ত গোমাংস ভক্ষণ করিলে কুষ্ঠ প্রভৃতি নানাবিধ উৎকট রোগাক্রান্ত হইবার সম্যক্ সম্ভাবনা।

হিন্দুশাস্ত্রমতে ইহার মাংসভক্ষণ অতিশয় পাপজনক। কলিকালে মধুপর্কে গোবধ ও গোমেধ যজ্ঞ নিষিদ্ধ। ইহার অনুষ্ঠানে পাপ হয়। শাস্ত্রে এইরূপ গোহত্যা নিষিদ্ধ ও গোদিগের প্রতি বিশেষ যত্ন ও সম্মান প্রদর্শনের কথা লিখিত থাকাতেই, সাত্বিক হিন্দুগণ গোহত্যার বিশেষ বিরোধী। গোহত্যাকারী বিধর্ম্মীদিগের সহিত এইজন্যই বহুদিন হইতে তাঁহাদের বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে। "আইন-ই অকবরী ও মুন্তখব উৎবারিক" পাঠে জানা যায় যে, এই জন্যই প্রজারঞ্জক আকবর বাদশাহ গোহত্যা-প্রথা এককালে উঠাইয়া দেন। কিন্তু হিন্দু-বিদ্বেষী আরঙ্গজেবের সময়ে এই প্রথা আবার বিশেষরূপে প্রচলিত হয়। পরে হিন্দু-প্রধান ভারতবর্ষে যাহাতে হিন্দুর সমক্ষে কোন মতে গোহত্যা না করা হয়, তজ্জন্য দিল্লীশ্বর শাহ আলম এক নিয়ম প্রচার করিয়াছিলেন। বঙ্গের নবাবগণও গো-হত্যা-নিবারণের জন্য যে কিরূপ চেষ্টা করিতেন, তাহা গোলাম হোসেন প্রণীত সিয়ারউলমুতাখিরীন্ নামক ইতিহাস পাঠে জানা যায়।

গোমূত্র—ক্ষার, কটু, তিক্ত ও কষায় রস, তীক্ষ্ণ উষ্ণবীর্য্য, লঘু, অগ্নিদীপ্তিকারক, মেধাজনক, পিত্তবৃদ্ধিকর; কফ, বায়ু, শূল, গুল্ম, উদরী, আনাহ (কোষ্ঠবদ্ধ), নেত্ররোগ, বিলাসরোগ, বাত, বস্তিবেদনা, কাশ, শ্বাস, শোথ, কামলা, প্লীহা ও পাণ্ডুরোগ নাশক। রজকেরা বলদের মূত্রে বস্ত্র ধৌত করিয়া থাকে।

গোময়—প্রজাপতির বরে গোমূত্র

ও গোময় পবিত্র হইয়াছে। গোময় দ্বারা দেবদেবীগণের অভিষেক করিবার বিধান আছে। মহাভারতে লিখিত আছে যে, গোগণ একদা লক্ষ্মীকে বলিয়াছিলেন যে, আমরা আপনাকে সম্মান করিব, আপনি আমাদিগের মূত্রে ও পুরীষে বাস করুন। লক্ষ্মী চঞ্চলা হইলেও তাহাদের প্রার্থনায় নিত্যই গোমূত্রে ও গোবরে অবস্থিতি করেন। গোময়ে জীবাণু সঞ্চিত হয় ও ইহা হইতে বৃশ্চিকাদি কীট উৎপন্ন [illegible]

স্মৃতিমতে বন্ধ্যা, যে [illegible]ৃতা ও নবপ্রসূতা এবং যে গাভীর শরীর অতিশয় জীর্ণ তাহাদের গোময় গ্রহণ করিতে নাই।

প্রাতঃকালে গাভীর বিষ্ঠা জলে গুলিয়া গৃহপ্রাঙ্গণে ছড়াইলে বায়ুর দোষ পরিহার হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা অপরিষ্কার স্থান ও দ্রব্য সংস্কৃত হইয়া থাকে। একবার একজন বিজ্ঞ ইংরেজ ডাক্তার জেলসমূহে অত্যন্ত মড়ক হইলে প্রাতঃকালে গোবর ছড়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ওয়ালেস্ সাহেব বলেন যে, শুকনো ফেকড়ীর আগুন হইতে যে স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হয়, ঘুঁটের আগুন হইতে সেরূপ হয় না। রন্ধনকার্য্যে ঘুঁটের আগুন ব্যবহার করিলে ঘরে আগুন লাগিবার সম্ভাবনা কম। আরও দেখা যায় যে, ঘুঁটের আগুনের আঁচ অনেকক্ষণ থাকে। উদরাময়-রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের রন্ধন ঘুঁটের আগুনে করিলে শীঘ্র পরিপাক হয়। ধাতুর জারণ প্রায় ঘুঁটের আগুনে হইয়া থাকে। মেটে ঘর দুয়ার, দেয়াল পবিত্র রাখিবার জন্য আমরা প্রত্যহ গোময় লেপন করিয়া থাকি। বাটীর দূষিত বায়ু পরিহার জন্য আমরা প্রত্যহ গৃহপ্রাঙ্গণে গোবর ছড়া দিয়া থাকি। হিন্দুশাস্ত্রমতে কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া কেহ যদি অশুচি হয়, তবে সে ব্যক্তি গোময় ভক্ষণ করিলেই পবিত্র হয়।

গোময় কৃষিক্ষেত্রের সারস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং ঘুঁটের আকারে জ্বালানি কাঠের কার্য্যও করিয়া থাকে।

গোময় ও গোমূত্রের যথার্থ সদ্ব্যবহারে এবং গোজাতির প্রতি যত্নে চঞ্চলা লক্ষ্মী অচলা হইয়া বাস করেন, এ কথাটি বড়ই সত্য। ভাবুক আর্য্য ঋষিগণ ইহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই গোবধ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। আজ কালকার লোকে এই সত্যটী ঠিক্ বুঝিতে পারিলেই দেশে পূর্ব্ব লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়া আসিবে, আশা করা যায়। (ক্রমশঃ)

ধ্বনি বা শব্দবিজ্ঞান।

(৩৭৭ সংখ্যা ৫৯ পৃষ্ঠার পর)

পুষ্করিণীর অভ্যন্তরে, দুই পারে দুই ব্যক্তি ডুবিয়া, একজন জলমধ্যে করতালি কিম্বা অন্য কোন প্রকার আঘাত করিলে, আর একজন জলমধ্যে অধিক দূরে থাকিয়াও শুনিতে পায়, ইহার কারণ জলের স্থিতিস্থাপকতা। কঠিন ও তরল উভয় পদার্থই শব্দ বহন করিতে পারে। জল অপেক্ষা কঠিন পদার্থ শব্দ শীঘ্র বহন করে। আর বায়ু অপেক্ষা জলাদি তরল পদার্থে শব্দের গতি প্রায় চতুর্গুণ দ্রুততর, ধাতুতে ১৪ গুণ এবং শুষ্ক কাঠের মধ্য দিয়া ১১ গুণ দ্রুত গমন করিয়া থাকে। বায়ুই সর্ব্বাপেক্ষা বিলম্বে শব্দ বহন করে। মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপোর্ট যুদ্ধকালে বিপক্ষদিগের গতি-বিধি শীঘ্র শুনিতে পাইবেন বলিয়া, স্বীয় সেনাগণকে নিঃশব্দ হইতে আজ্ঞা দিয়া স্বয়ং ভূমিতে কর্ণ পাতিয়া শুনিতেন।

শূন্যে শব্দ করিলে বায়ুর কম্পন চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। মসৃণ দেওয়াল অথবা সমপৃষ্ঠ জল কেবল একদিকের ব্যাপ্তি মাত্র নিবারণ করে, অথচ উহা দ্বারা শব্দ বহু দূরে নীত হয়। মসৃণ দেওয়ালের নিকটস্থ ব্যক্তিরা দূর হইতেও কথোপকথন করিতে পারে, এবং হ্রদের নিকট কুকুরের শব্দ কখন কখন সন্ধ্যাকালে পাঁচ মাইল অন্তরেও শুনা গিয়াছে। গোলাকার ঘরের দেওয়ালের নিকট দাঁড়াইয়া দুই জনে পরস্পর দূর-স্থিত হইয়া আস্তে আস্তে পরামর্শ করিতে পারে।

দিবা অপেক্ষা রাত্রিতে শব্দ ভাল শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ প্রথমতঃ, অনেক গোলমাল হইতে থা ঃ, দিবাভাগে সূর্য্যতাপ দ্বারা পৃথিবীর নিকটস্থ বায়ু সর্ব্বদা উপরে উঠিতেছে, এবং ঊর্দ্ধের অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু আসিয়া তৎস্থান অধিকার করিতেছে। রাত্রিকালে বায়ুস্তরের এরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। প্রায় সকল বায়ুস্তরেই একরূপ তাপাংশ ও একরূপ সান্দ্রতা (density) থাকে; সুতরাং একরূপ সান্দ্রতা যুক্ত পদার্থের মধ্য দিয়া আসাতে শব্দের অধিক হ্রাস হইতে পারে না।

পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইল, তদ্দ্বারা পাঠিকা-বর্গের মনে অবশ্যই এরূপ ভাবের উদয় হইবে যে, শব্দ ও আলোকের প্রতিফলন প্রভৃতির নিয়ম যখন একরূপই হইল, তখন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ন্যায় দূরশ্রবণের যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়া বিচিত্র নহে; ফলতঃ দূরশ্রবণের যন্ত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে। দৃষ্টিবিজ্ঞান-শাস্ত্র-প্রসাদে যেমন ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তিগণের নূতন চক্ষু হইয়াছে, শব্দ-বিজ্ঞান শাস্ত্র দ্বারাও তেমনই বধিরের কর্ণ

হইয়াছে বলিলেই হয়। ক্ষীণশ্রবণ ব্যক্তিদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত এক প্রকার শিঙ্গার আবিষ্কার হইয়াছে, ঐ শিঙ্গার যে মুখে শব্দ প্রবেশ করে তাহা প্রশস্ত; যে মুখ কর্ণে সংলগ্ন করা হয়, সে মুখ সংকীর্ণ; পার্শ্বদেশ এরূপ বক্র যে, বায়ুর কম্পন সকল তদ্দ্বারা প্রতিফলিত হইয়া কর্ণের নিকট আসিয়া অধিশ্রয় প্রাপ্ত হয়, সুতরাং শব্দ সকল ঘনীভূত হইয়া কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। শ্রবণ যন্ত্রের ন্যায় আবার কথন-যন্ত্রেরও সৃষ্টি হইয়াছে। দূরস্থিত ব্যক্তিকে আহ্বান করিবার পক্ষে উহা বিলক্ষণ উপযোগী।

কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে কর বাঁকাইয়া ধরিলে এক-প্রকার শ্রবণ-যন্ত্রের কার্য্য হইয়া থাকে। শ্বাপদ জন্তুগণের কর্ণ সম্মুখদিকে কোর করা, এই নিমিত্ত তাহারা সম্মুখদেশ হইতে আগত শব্দ সুন্দররূপ শ্রবণ করিতে পারে। তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের যে উপায় নির্দ্ধারিত আছে, তাহাতে ঐরূপ হওয়াই আবশ্যক, কারণ পলায়মান পশুগণের সঞ্চার-ধ্বনি শ্রবণ করাই তাহাদের জীবিকার প্রধান উপায়। এ দিকে শশক প্রভৃতি যে সমস্ত জন্তু উহাদের কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহাদের কর্ণ পশ্চাদ্দিকে কোর করা। এরূপ হওয়াতে তাহারা ধারণকারী জন্তুর সঞ্চার অনায়াসে বুঝিতে পারিয়া পলায়নপূর্ব্বক জীবন রক্ষা করিতে পারে।

প্রতিফলিত শব্দসমুদায় এক অধিশ্রয়ে সংগ্রহ করিবার যে উপায় আছে, প্রাচীনদিগের মধ্যে তাহা অবিদিত ছিল না। "ডায়নিসিয়সের কর্ণ" নামক সাইরাকিউস নগরের কারাগারে যে যন্ত্রটী ছিল, তাহা অতিশয় কৌতুকাবহ। উক্ত কারাগারের অন্তশ্ছাদের এরূপ গঠন ছিল যে, সামান্য শব্দ করিলেও তাহা ঘনীভূত হইয়া একটী অধিশ্রয়ে সমবেত এবং একটী গুপ্ত সুড়ঙ্গ দ্বারা দূরে নীত হইত। ডায়নিসিয়স সেই সুড়ঙ্গের প্রান্তে বসিয়া বন্দীদিগের সমুদায় পরামর্শ শুনিতেন।

(ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

(৩৭৬ সং—১৭পৃষ্ঠার পর)

ক্রিমি।

১। খেজুরপত্রের রস অথবা পালিতা (মাদার) পত্রের বা ঘেঁটু পত্রের (ভাঁট পাতার) রস কিম্বা চূণের জল ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত সেবন করাইলে ক্রিমি রোগের শান্তি হয়।

২। উচ্ছেপাতার রস গরম জলে মিশাইয়া

পান করাইবে, তাহাতে ক্রিমি রোগের নিবৃত্তি হয়। শূন্যোদরে নিমপাতার রস মধুসহ সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

৩। বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, যবক্ষার, কমলা গুড়ি, হরীতকী এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, তক্রের সহিত বাটিয়া ভক্ষণ করিলে সকল প্রকার ক্রিমি নষ্ট হয়।

৪। আনারসের কচি পাতার রস মিছরির গুঁড়ার সহিত সেবন করিলে, অথবা কিঞ্চিৎ সোমরাজের বীজ লবণের সহিত খাইলে ক্রিমি নিবারণ হইয়া থাকে।

৫। মুলতানি হিং, মুসব্বর, রেউচিনি, কাবাবচিনি, প্রত্যেকটী সমভাগ লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া মসুর কলায়ের ন্যায় বটী প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ প্রাতে ১টী বটী উষ্ণ জল সহ সেবন করিবে। ইহাতে ক্রিমি ও তদানুষঙ্গিক অজীর্ণ, উদারাময় ও তরল ভেদ নিবৃত্ত হয়।

৭। কাঞ্জি, নালিতাপাতার জল, চিরেতার জল, চূণের জল, মধুসহ বিড়ঙ্গ চূর্ণ, এই সকল দ্রব্য সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হইয়া থাকে।

৭। শাঞ্চি শাকের পাতার রস দুই তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ক্রিমি সমুদায় মৃত ও পতিত হয়।

বাতবেদনা।

১। রসুন এক তোলা, গোলমরিচ ১ তোলা, লাল ভেরেণ্ডার শিকড় ১ তোলা বাসী হুঁকার জলে বাটিয়া অল্প উষ্ণ করিয়া, অথবা কৃষ্ণ জীরা পিপুল, নাটার বীজের শস্য ও শুণ্ঠী সমভাগে লইয়া আদার রসে উত্তমরূপে বাটিয়া অগ্নিতে কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া বেদনা-স্থানে দিবসে ২।৩ বার প্রলেপ দিলে, বাত-বেদনার শান্তি হয়।

২। কর্পূর ১ ভাগ, তার্পিণ তৈল ২ ভাগ, সর্ষপ তৈল ৪ ভাগ, একত্রে মিশাইয়া মালিস করিলে, বা দূর্ব্বা ও হরিদ্রা একত্রে বাটিয়া লেপ দিলে, অথবা বালুকার পুটলী উষ্ণ করিয়া রুক্ষ সেঁক দিলে বাত বেদনার বিশেষ উপকার হয়।

৩। দশমূল, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, রাস্না, শুঁঠ, দেবদারু, এই সকলের কাথ এরণ্ডতৈলের সহিত সেবনে আমবাত আরোগ্য হয়।

৪। বাতরোগগ্রস্তদিগের অত্যন্ত কাম-ড়ানী স্থানে মেটে তৈল বা কেরোসিন তৈল অথবা শুশুকের তৈল মাখাইয়া খানিকক্ষণ রৌদ্র লাগাইলে ঘর্ম্ম হইয়া আশু কামড়ানী নিবারিত হয়।

৫। ঘোলের সহিত কোঁতরা গুড় মিশা-ইয়া সেবন করিলে বাতের উপকার হয়।

৬। পায়ের গোড়ালি বা পায়ের তলায় অত্যন্ত বেদনা হইলে গরম উনানের বা গরম ইটের উপর পা চাপিয়া ধরিলে ভাল হয়।

৭। বিছুটীর শিকড় কোমরে ধারণ করিলে কোমরের বাতে-ধরা আরোগ্য হয়।

৮। চূণ ও হরিদ্রা একত্র মিশাইয়া

জরচূর্ণ করিয়া পুনঃ পুনঃ লেপ দিলে সচকান্ বেদনা আশু তিরোহিত হয়।

৯। সিমপাতার রস চূণের সহিত মিশাইয়া পীড়িত স্থানে প্রয়োগ করিলে গলবেদনা নিবারিত হয়।

১০। কৃষ্ণ ধুতুরার পাতা উনানের পোড়া মাটীর সহিত লবণ দিয়া বাটিয়া ২।৩ বার উহা মালিস করিলে বাত ভাল হয়।

১১। বিছুটীর পাতা ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে গাত্রের আমবাত আরোগ্য হয়।

স্বর্গীয়া অঘোরকামিনী।

পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখং॥

যে নারী পতির প্রিয় হিতকর কার্য্যে নিযুক্তা, সদাচারা ও সংযতচিত্তা, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তিলাভ করেন এবং পরলোকে অনুপম সুখ সম্ভোগ করেন।

আমরা উপরে আদর্শ রমণীর লক্ষণ ও সৌভাগ্যসূচক যে প্রাচীন শ্লোকটী উদ্ধৃত করিলাম, স্বর্গগতা অঘোরকামিনী রায়ের জীবনে ইহার সার্থকতা দর্শন করিয়াছি। এইজন্য আনন্দের সহিত ইহাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

অঘোরকামিনী বাঁকীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু প্রকাশচন্দ্র রায়ের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। হৃৎপিণ্ডে বাতাশ্রয় করাতে ১৮ দিন পীড়া ভোগ করিয়া গত ২১শে জুন পরলোক গমন করিয়াছেন। ইহাঁর বিয়োগে কেবল ইহাঁর আত্মীয়গণ নহেন, যাঁহারা ইহাঁর বিষয় কিছু জানিতেন, তাঁহারা সকলেই মর্ম্মাহত হইয়া হাহাকার করিতেছেন।

১৮৫৪ সালে জেলা ২৪ পরগণার টাকী গ্রামের এক ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত কায়স্থের ঘরে অঘোরকামিনীর জন্ম হয়। বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষালাভের সুযোগ ঘটে নাই। বয়স যখন ১০ বৎসর, তখন প্রকাশ বাবুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। প্রকাশ বাবু ভবানীপুর লণ্ডন মিসনরী কলেজে যখন বি, এ, পড়েন, তখন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়াতে গৃহচ্যুত ও নিরুপায় অবস্থায় পতিত হন। এই সময় তাঁহার পত্নীর বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর মাত্র। প্রকাশ বাবু ডাকবিভাগে একটী কার্য্য জুটাইয়া বর্দ্ধমানে আসিলেন, তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সঙ্গিনী হইলেন। স্বামীর তখন আয় অল্প এবং তিনি নানা স্থানে বদলী হওয়াতে সাংসারিক সুব্যবস্থা হওয়া কঠিন, কিন্তু পত্নী সেই অল্প বয়সে মিতব্যয়িতা ও গৃহকার্য্যে দক্ষতা দ্বারা স্বামীর সকল অভাব পূরণ ও কিছু কিছু সংস্থান করিয়া দিতে লাগিলেন। পতি পত্নীর মধ্যে প্রণয় গাঢ় হইতে লাগিল এবং পবিত্র আধ্যাত্মিক দাম্পত্যযোগে সংসারধর্ম্ম পালন করিবেন, উভয়েরই

মনে এই আশা প্রবল হইল। স্বামীর সাহায্যে স্ত্রী শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন এবং গৃহকার্য্য করিয়া যে সময়ে অবকাশ পাইতেন, স্বামীর সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও স্বামীর বৈষয়িক কার্য্যের সহায়তায় তাহা ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সংসার বড় সুখের সংসার হইল।

১৮৮১ সালে স্বামী ও স্ত্রী একসঙ্গে কলিকাতায় স্বর্গীয় বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। এই ঘটনায় অঘোরকামিনীর জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত ও এক নূতন পথে ধাবিত হয়। কেশব বাবু অনেকটা মানবপ্রকৃতির জহরী ছিলেন। তিনি এই রমণীকে দেখিয়া বিশেষ প্রীত হন এবং তাঁহার মধ্যে যে অতি উচ্চ দেব-ভাব লুক্কায়িত আছে, তাহা বুঝিতে পারেন। তিনি ইহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন "আমার জীবনের একটী বড় সাধ যে জগতের সম্মুখে আদর্শ রমণী-চরিত্র ধরিয়া দেখাই; তোমার মত মেয়েকে হাতে পাইলে সেই সাধ পূর্ণ করিতে পারি।" সাধুমুখের এই কথা অঘোরকামিনী ঈশ্বর-বাণী বলিয়া অনুভব করিলেন এবং ইহা তাঁহার হৃদয়ে অমোঘরূপে মুদ্রিত হইল। তিনি ক্রমাগত সেই কথা মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন এবং কলিকাতা হইতে বাঁকিপুরে ফিরিয়া আসিয়া অন্তরে তাহারই জল্পনা করেন। ইহা দ্বারা তাঁহার দৃষ্টি উজ্জ্বল হইল, হৃদয় প্রশস্ত হইল এবং আত্মার মধ্যে পবিত্র উচ্চ আশা দিন দিন সঞ্চারিত হইতে লাগিল। এ সময় তাঁহার সন্তান সন্ততি হইয়াছিল। তিনি স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, উভয়ে আর সাংসারিক ভাবে জীবন যাপন করিবেন না, উভয়ের মিলন আধ্যাত্মিক মিলন এবং এখন হইতে সেই ভাবে জীবনগঠনের জন্য উভয়ে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রত গ্রহণ করিলেন। স্বামী যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহা স্ত্রীর হস্তে দিতেন এবং স্ত্রী তাহা কেবল নিজের বা স্বামী ও সন্তানগণের সুখবর্দ্ধনে নিয়োগ না করিয়া ঠিক ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে ব্যয় করিতে চেষ্টা করিতেন। অঘোরকামিনী জানিতেন টাকা ঈশ্বরের পবিত্র গচ্ছিত ধন, বাজার হইতে কোনও জিনিস পত্র আসিলে তাহাও ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ না করিয়া ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার গৃহ একটী অতিথিশালার ন্যায় ছিল, নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মগণ আসিয়া তথায় সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেন এবং গৃহিণী পরিতোষপূর্ব্বক অতিথিদিগের সেবা করিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিতেন। কত পিতৃহীন সন্তান ও নিরুপায় বিধবা তাঁহার গৃহে আশ্রয় লাভ করিতেন। তিনি সংসারকে যথার্থ ধর্ম্মের সংসার এবং গৃহকে দেবালয়ে পরিণত করিয়াছিলেন। দিনের মধ্যে পাঁচ বার ব্রহ্মোপাসনা হইত এবং সমস্ত দিন তথায় ঈশ্বরের নাম শ্রুত হইত। যিনি

এই গৃহে একদিন বাস করিয়াছেন, তিনিই ইহার স্বর্গীয় ভাবে মুগ্ধ হইয়াছেন।

প্রকাশ বাবু নিজে অতি সরলপ্রকৃতি সাধু সদাশয় পুরুষ; তিনি দেশহিতকর কার্য্যে সর্ব্বদা উৎসাহশীল এবং স্ত্রীকে তাহাতে প্রবর্ত্তিত করিতেন। স্ত্রীও তাঁহার প্রিয় কার্য্যকে প্রাণের প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

বাঁকীপুরে একটী বালিকা-বিদ্যালয় আছে, অঘোরকামিনী প্রতিদিন তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর ইচ্ছা হইল, বালিকাদের জন্য একটি "Boarding House" আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবেন। কিন্তু সুন্দররূপে তাহা গঠন ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালন করিতে না পারিলে তাঁহাদিগের মনোগত উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে না, এই জন্য তিনি একটী অসমসাহসিক কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিলেন। বয়স্কা গৃহিণী, সন্তানগণের জননী—আপনার ঘর সংসার পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে গমনপূর্ব্বক বালিকার ন্যায় শিক্ষাকার্য্যে কি প্রবৃত্ত হইতে পারেন? এ দেশে কোনও রমণী এ পর্য্যন্ত এরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন কি? অঘোরকামিনী বিশ্বাসের আলোকে চলিতে শিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার মতে "পারি না" এ কথা বিশ্বাসীর মুখ হইতে বাহির হইতে পারে না। যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিতেই হইবে, এই তাঁহার ধ্রুব জ্ঞান ছিল। তিনি লক্ষ্ণৌয়ে গমন করিয়া কুমারী থোবরণের স্কুলের অধিবাসিনী ছাত্রী (boarder) হইলেন এবং বোর্ডিংএর বন্দোবস্ত কিরূপ এবং তাহার কার্য্য কিরূপে চালাইতে হয়, এ সকল তন্ন তন্ন করিয়া শিক্ষা করিলেন। কি জ্ঞানস্পৃহা কি ইচ্ছা শক্তি, কি দায়িত্ববোধ, কি পর-হিতার্থে ত্যাগস্বীকার! বিশ্বহিতব্রতধারিণী খ্রীষ্টীয় রমণীগণের সংসর্গে বিশ্বহিতসাধনের ইচ্ছা তাঁহার মনে আরও প্রবল হইয়া উঠিল এবং তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন সম্পূর্ণরূপে সেই কার্য্যে উৎসর্গ করিলেন।

বাঁকীপুরে প্রকাশ বাবুর স্থাপিত "বালিকাশ্রম" এ দেশের একটী প্রকৃষ্ট শুভ অনুষ্ঠান। ইহা তাঁহার সহধর্ম্মিণী অঘোরকামিনীর পুণ্যকীর্ত্তি। এখানে পিতৃমাতৃহীনা বা পিতামাতা হইতে বিচ্ছিন্না দূরদেশবাসিনী অনেকগুলি বালিকা আছে। অঘোরকামিনী এই আশ্রমগৃহকে আপনার গৃহ করিয়াছিলেন এবং বালিকাদিগকে কন্যা নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মশিক্ষা দান করিতেন। তাঁহার স্বামীর উপার্জিত ধনের অনেক অংশ ইহাতে ব্যয়িত হইত। কোন্ ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট-পত্নী আপনার স্বামীর ধন আপনার সাজ সজ্জা ও আপনার সন্তানগণের সুখবর্দ্ধনে নিয়োগ না করিয়া পরের ছেলেদের জন্য অকাতরে ব্যয় করিতে পারেন? আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, তিনি আপনার মেয়েদিগের জন্য সোনার বালা গড়াইতে দেন নাই, বলিতেন আশ্রমের বাছাদের

হাতে সোনার বালা না দিয়া নিজের মেয়েদের হাতে তাহা দেওয়া পাপ। কি আশ্চর্য্য দেবভাব!

পরোপকার-ব্রতে তিনি আপনার জীবনকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে যেখানে রোগ, শোক, দুঃখ, যন্ত্রণা, সেইখানেই তিনি উপস্থিত হইতেন এবং প্রাণপণে তাহার অপনোদনের চেষ্টা করিতেন। পরের সেবা শুশ্রূষায় তিনি ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া বোধ করিতেন না, প্রত্যুত তাহাতে মহা আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি কার্য্য করিতে কখনও ক্লান্ত হইতেন না। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা আছে। এক সময় বাঁকীপুরের এক মুন্‌সেফ বদলী হইয়া যাইবেন, তাহার স্ত্রী পূর্ণগর্ভা এবং একটী পুত্র মুমূর্ষু। অঘোরকামিনী আপনার ঘরসংসার ফেলিয়া সেই বিপন্ন রমণীর গৃহে আসিলেন, মাতার ন্যায় যত্নে দিন রাত্রি সমভাবে সেবা শুশ্রূষা করিয়া সন্তানটীকে আরোগ্য করিয়া তুলিলেন। আর এক সময় আঁতুড় ঘরে একটী গরিব স্ত্রীলোক মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন। অঘোরকামিনী এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার বাটীতে গিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করিলেন। তিনি স্বহস্তে তাহার মলমূত্র পরিষ্কার করিয়া তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলেন এবং যতদিন স্ত্রীলোকটী সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইল, ততদিন তাহার কাছছাড়া হইলেন না। বাঁকীপুরে যখন বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন সকলে ভীত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি নির্ভয়ে মহোৎসাহের সহিত রোগীদিগের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং অনেককে বাঁচাইয়াছিলেন।

নরনারীর আত্মাকে সাংসারিকতা ও পাপতাপ হইতে উদ্ধার করিয়া ঈশ্বরের চরণে আনিবার জন্যও তাঁহার একান্ত আগ্রহ ছিল। কখন কখন তিনি পল্লীগ্রাম ভ্রমণ করিতে যাইতেন, গরিবদিগের কুটীরে গিয়া তাহাদের দুঃখে অশ্রুপাত করিতেন, এবং ধর্ম্মোপদেশ ও সান্ত্বনা দান করিয়া তাহাদিগকে সুখী দেখিয়া আপনি সুখী হইতেন।

অঘোরকামিনী সংসারাসক্তিশূন্যা ধর্ম্মপ্রাণা বিশ্বসেবা-ব্রতপরায়ণা ছিলেন। এরূপ রমণীরত্ন যে ইহলোকে মহতী কীর্ত্তি লাভ করিবেন এবং পরলোকে তাঁহার পুণ্যের পুরস্কার স্বরূপ অনুপম সুখের অধিকারিণী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? প্রেমময় পরমেশ্বর তাঁহার আত্মার চির শান্তি ও কল্যাণ বিধান করুন এবং বঙ্গনারীদিগকে তাঁহার সাধু দৃষ্টান্তের অনুগামিনী করুন।*

* এই জীবনীর অনেক বিবরণ "Unity and Minister" পত্র হইতে সংগৃহীত। বা, বো, স।

অদ্ভুত আখ্যায়িকা।

পূর্ব্ব অঞ্চলে যমুনা নদীর তীরবর্ত্তী একটী মনোহর কুঞ্জকুটীরে পিতা মাতার সঙ্গে একতা-নাম্নী এক ব্রাহ্মণবালিকা বাস করিত। বালিকা দর্শনশাস্ত্রে প্রভূত ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল। তাহার বয়স অনুমান পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হইবে না। এই অত্যল্প কালেই তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে বহুপরিমাণে ভগবদ্‌ভক্তির সঞ্চার হয়। নিভৃত অরণ্যানীর বিকশিত ফুলরাজি সম এই স্থির শান্তশীলা বালিকা চারিপাশে পবিত্র মধুরিমা বিকীর্ণ করিয়া বেড়াইত।

যমুনা-জল-ধৌত কুটীরখানি পবিত্রতার জীবন্ত মূর্ত্তি। পরিষ্কার আঙ্গিনা, চারিপাশে নবদূর্ব্বার শ্যাম আস্তরণ। বালিকার স্বহস্ত-নির্ম্মিত উদ্যানস্থলী বিধৌত করিয়া পূর্ণ-সলিল আলবাল ক্রীড়া করিতেছে। সেই পবিত্র ক্ষুদ্র কুঞ্জগৃহ পরিবেষ্টন করিয়া যমুনা পরিখারূপে সতত বহমানা। এই ক্ষুদ্র বালিকার উপযোগী ক্ষুদ্র কুঞ্জকুটীরে প্রয়োজনীয় কিছু কিছু দ্রব্যাদি সুশৃঙ্খল ভাবে সুসজ্জিত আছে। সৎশিক্ষাপরায়ণা বালিকা ক্ষিপ্রহস্তে নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য-কলাপ সমাধা করিয়া দিনের অবশিষ্ট অংশ ভগবদনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া অতিবাহিত করে। বালিকা একতার খেলাঘরে ফুল চাঁদোয়ার নীচে শালগ্রাম শিলা দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট বালিকা ছোট হাতে ছোট ছোট ডাল ভাঙ্গিয়া ডালা ভরিয়া ফুল চয়ন করিয়া আনে, বালিকার ছোট আঁচলখানি শিশিরে ভিজিয়া যায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঙ্গুলগুলি ফুলরেণুতে মাখা মাখা হয়।

শিশু রবি কোলে করিয়া যখন ঊষা দেবী পূর্ব্বগগনে বাহির হন, বালিকার স্নানের সেইটিই উপযুক্ত সময়। সে বায়ু-চুম্বিত লহরীমালায় চূর্ণকুন্তল ছড়াইয়া তরঙ্গা-লোড়িত পদ্মপত্রের ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইতে থাকে। ছোট ছোট পাখীদল কোলাহল করিতে করিতে মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যায়। সে স্নানান্তে পুষ্প-সজ্জিত ডালা লইয়া পূজা করিতে বসে। সে পূজা দেখিলে বিষয়-রাজ্যে বিচরণ-শীল মানবের অন্তরেও ঔদাস্যের উদয় হয়। ভগবৎ-প্রেমানু-রাগে যখন তাহার পদ্মনেত্র ঢল ঢলে হয়, হাসির উপরে আঁখির জল গড়াইয়া পড়ে, তখন বনদেবতাও তাহাকে পূজা করিতে থাকে, কেননা তাহার শরীরের উপরে সদ্যোজাত শিশির সিঞ্চিত হয়। দক্ষিণা হাওয়ায় ছিন্নবৃন্ত কুসুমনিচয় প্রতিনিয়তই মাথার উপর পড়িতে থাকে। সেই সময় আবার নব-কোকিলাও কলকণ্ঠে হুলুধ্বনি চালিতে আরম্ভ করে।

বালিকার পিতা মাতা অদূরে উপবেশন করিয়া এই স্বর্গীয় দৃশ্য অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইয়া যান। সরলতা, ধৃতি, ক্ষমা ও নিষ্ঠা নামে একতার আরও চারিজন সখী আছে,

তাহারাও একতার সরলতায় অনুপ্রাণিত।

একতার বিলাসাভিলাষ নাই, ধন সঞ্চয়ের ইচ্ছা নাই, রূপের আকাঙ্ক্ষা বা যশের তৃষা বা বিলাসের স্পৃহা নাই, মান বা অভিমানের লেশমাত্র নাই। বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে কেবল ভগবৎস্নেহানুরাগের প্রবল আধিপত্য। তাঁহার সঙ্গিনীগণও সম্পূর্ণ তাঁহারই মতাবলম্বিনী।

একতা শয়নোপবেশনেও ভগবদনুগ্রহ বিস্মৃত হইত না। যদিও তাহার অবিদিত ছিল না যে, এই বাহ্য জগৎ সেই অনন্ত পুরুষের ছায়া মাত্র, আধ্যাত্মিক রাজ্যে আপনার আত্মাতেই পরমাত্মার প্রকৃত বিকাশস্থল, তথাপিও সৃষ্টির অতুলাননে স্রষ্টার কিঞ্চিৎ আভাস সন্দর্শন করিতে ভাল বাসিত। তাই বর্ষার সায়ংকালে ঘোর বেগবতী যমুনার কুলকুলধ্বনি, মৃদুল বাতাসে লতিকাদলের অলকদামে শিশির-শিকরমিশ্রিত পরাগচূর্ণে অন্ধকৃতা ভ্রমরার নিদ্রিত ছবি দেখিয়া শান্তি বোধ করিত। ক্ষুদ্র বালিকার সুখের দিনগুলি এই ভাবে ধীরে ধীরে গত হইল। পঞ্চদশ বৎসরের বালিকা এখন ষোড়শ বৎসরের পূর্ণ-অবয়বা যুবতী। এখনও অবিবাহিতা, চারি পাশের সদ্গুণসম্পন্ন যুবক দল তাহার পাণি-গ্রহণেচ্ছু হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সে বিবাহে সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিতেছে। একতা কিছুতেই পিতা মাতার অবাধ্য নহে। কিন্তু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবাধ্যতা দেখাইতে লাগিল। তাহার কারণ এই চতুর্দ্দশ বৎসরের সময় একতা একদিন নির্ম্মল যমুনা-সৈকতে উপবেশন করিয়া নীল যমুনা-উর্ম্মির অদ্ভুত পতন উত্থান নির্নিমেষনেত্রে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। ভাব এবং কল্পনার মাঝখান দিয়া মনটা কখন স্বর্গে উঠিতেছিল, কখন পাতালে ডুবিতেছিল, কখন জলের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, কখন বা অণু হইতে অণু হইয়া ক্ষুদ্র মানবের পদতলে দলিত হইতেছিল, আবার বৃহৎ হইতে বৃহৎ হইয়া পরোপকারব্রতধারিণীরূপে ধর্ম্মজগতের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে নাচিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ একটী সুমধুর গীতধ্বনি কর্ণগোচর হওয়াতে তাহার সে মোহ ভঙ্গ হইল। ভ্রমরা-ভর-স্পন্দিত পল্লব-মধ্যস্থিত বিকশিত গোলাপপুষ্পবৎ ঈষৎ বিচলিত হইয়া চাহিয়া দেখিল। যাহা দেখিল তাহাতে সুখে তাহার প্রাণ ভরিয়া গেল, কি দেখিল? একখানি বজরার ছাদের উপর চেয়ারে বসিয়া এক জন তরুণবয়স্ক যুবক গান করিতেছেন। যুবককে কোন স্বর্গভ্রষ্ট দেবকুমার বলিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মিল। একতা সতৃষ্ণ লোচনে সেই অনুপম মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। এমন সুন্দর, এমন মধুর জিনিষ যে জগতে আছে, তাহা যেন সে এই প্রথম জানিতে পারিল। নৌকা তীর ঘেঁসিয়া চলিতেছিল, অতএব একতা ইহাও দেখিল যে, সেই যুবাপুরুষের ঢল ঢল নেত্রদ্বয় তাহার মতনই সতৃষ্ণ নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

সঙ্গীতের এক একটী কথা এক একটী পবিত্র দেবতার মত স্ব-ইচ্ছায় বাহির হইয়া আকাশপথে উত্থিত হইতেছে। সর্ সর্ করিতে করিতে পালের নৌকা কোথায় চলিয়া গেল। গ্রীবা উত্তোলন করিয়া একতা সেই চঞ্চলগামী নৌকার দিকে চাহিয়া রহিল। নৌকা আর দেখিতে পাইল না। কিন্তু সেই সঙ্গীতরব—

"তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী"—সুখের স্বপ্নের মত অনেকক্ষণ কাণে বাজিতেছিল। তাহার পর সরীসৃপের ন্যায় চঞ্চলগমনে সন্ধ্যাদেবীর সমাগম হইল। একতা উঠিল, তাহার নিস্তরঙ্গ মানস-সরসে ঘোর চঞ্চলতার ঢেউ বহিল। সে ইতিপূর্ব্বে শিক্ষা পাইয়াছিল যে, "পতিভক্তি ভগবদ্‌ভক্তির প্রথম সোপান;" অতএব এই চাঞ্চল্য ভাবকে মন হইতে বিদূরিত করিবার এবং চঞ্চল হৃদয়কে সংযত করিবার কোনরূপ চেষ্টা করিল না। মন যাহাকে চাহিবে, একতা তাহাকেই বিবাহ করিবে, এই তাহার স্থির সঙ্কল্প ছিল। আজ তাহার মন বিহঙ্গিনীর ন্যায় পাখা বিস্তার করিয়া ধর্ম্ম-জগতের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে পতি দেবতার অনুসরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। সে রাত্রি একতা কেবল সেই মুখের সেই সঙ্গীত স্বপ্নে শুনিতে শুনিতে রজনী প্রভাত করিল। পর দিন নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য কলাপের কোনরূপ ব্যাঘাত হইল না। নিত্যকর্ম্ম সমাধা হইলে প্রাণের অনির্দ্দিষ্ট আদেশে যমুনার সেই বালুকাময় তটদেশে গিয়া উপবেশন করিল। ক্ষণকাল পরে তেমনি লহরের উপর লহর তুলিতে তুলিতে বজরা আসিয়া পঁহুছিল।

একতা দেখিল সেই দেবকুমার তেমনি ভাবে বসিয়া গান করিতেছে।—"তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী, আমায় দেও দুখ দেও তাপ সকলি সহিব আমি।" একতা প্রাণ ভরিয়া সেই রূপ দেখিতে লাগিল। আবার পূর্ব্ববৎ চারি চক্ষের মিলন হইল। দেখিতে দেখিতে নৌকা কোথায় চলিয়া গেল, একতা আর দেখিতে পাইল না। সন্ধ্যা হইল দেখিয়া একতা ভগবান্‌কে প্রণাম ও সেই দেবপুত্র-কান্তি যুবককে আত্মসমর্পণ করিয়া চলিয়া গেল। তাহার হৃদয় আজ নূতন বলে বলীয়ান্। আজিও সে সারা রজনী সেই যুবককে স্বপ্নে দেখিল "যেন তিনি মানব নন—দেবতা। সেই দেবতার পূজার আয়োজন করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইল।" পরদিন অপরাহ্ণে হঠাৎ একটা এলোমেলো বাতাস উঠিল। একতা যমুনা সৈকতে উপবেশন করিয়া উদ্বিগ্ন-চিত্তে নৌকার প্রতীক্ষা করিতেছিল, এমন সময়ে স্বর্গের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়া নৌকা আসিয়া পঁহুছিল।

প্রবল বাতাসে নৌকা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। মাঝিরা অনেক পরিশ্রম করিতেছে, কিন্তু নৌকা অল্প অগ্রসর হয় আবার দ্বিগুণবেগে পশ্চাদ্ভাগে সরিয়া যায়। এমনি ভাবে নৌকা চলার অনেক ব্যাঘাত হইল। এ বিলম্ব একতার

পক্ষে প্রীতিকর নয় কি? অনেকক্ষণ পরে নৌকা চলিয়া গেল। অন্যমনস্ক হইয়া একতা যমুনালহরী অবলোকন করিতেছে, এমন সময় একজন স্ত্রীলোক ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সেইখান দিয়া চলিয়া যায়। একতার সূক্ষ্ম দৃষ্টি তাহা লক্ষ্য করিল এবং ধীরকণ্ঠে কহিল, কে তুমি? রমণী সেই মহিমাময়ী একতার দেহবিকাশের পারিপাট্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, মনে মনে কহিল তুমিই বা কে? বুঝি বা সমস্ত দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইবে! জানি না তুমি কাহার অঙ্কলক্ষ্মী। অয়ি কুটীরবাসিনি! তোমাকে দেশের সাম্রাজ্ঞী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রকাশ্যে কহিল আমি রাজার দাসী। বলা বাহুল্য যে এ দেশে একজন রাজা আছেন। একতা কহিল, তুমি কোথা যাও? দাসী বলিল, আমাদের যুবরাজ প্রত্যহ এই খান দিয়া বজরায় জলপথে বেড়াইতে যান। আজ অসাবধানতা বশতঃ একটি প্রয়োজনীয় জিনিষ ফেলিয়া গিয়াছেন, রাজমাতার অনুমতিক্রমে সেই বস্তুটি তাঁহাকে সমর্পণ করিতে যাইতেছি। হঠাৎ রাজপুত্রের কথা শুনিয়া একেবারে যুগপৎ হরিষ, বিষাদ, ভয়, লজ্জা একতার হৃদয়ে বহিয়া গেল। (সে জানিত যে দেশের রাজা ব্রাহ্মণ এবং তাঁহাদের স্বজাতি)। একতা বাধ বাধ আওয়াজে বলিল, কি জিনিষ?

দাসী রাজপুত্রের জিনিষ, রাজমাতার অনুমতি ভুলিয়া গেল, নিতান্ত মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আত্মহারা হইয়া নিজের অজ্ঞাতে ওড়নার ভিতর হইতে একটি ক্ষুদ্র রৌপ্যের বাক্স বাহির করিয়া একতার হাতে দিল। চাবী বাক্সের সঙ্গে যুক্ত আছে। পবন-শিহরিণী বাণীর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে একতা বাক্স খুলিল, খুলিবা মাত্র নির্ম্মাল্যের সুগন্ধে প্রাণ মাতিয়া উঠিল। ক্ষুদ্র বাক্সে চন্দনচর্চ্চিত প্রসাদি পুষ্প সজ্জিত রহিয়াছে, তাহার ভিতর একখানি ফটোগ্রাফ রহিয়াছে, তাহার নীচে নাম লেখা আছে "কুমার রাজসিংহ"। একতা দেখিল নিজ হৃদয়ে যাহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, এ মূর্ত্তি তাহারই—একতা আনত-আননে কহিল, ঝি! এই ছবিখানি আমাকে দিতে পার? দাসী কহিল, হাঁ পারি। একতা কহিল, আপনার জিনিষ হারাইয়া রাজপুত্র তোমায় ভর্ৎসনা করিবেন না? হাঁ করিবেন বৈ কি, কিন্তু আমি তখন উত্তর দিব, বলিয়া দাসী বিদ্যুৎবেগে চলিয়া গেল। কিন্তু হায়! তাহার পরদিন হইতে একতা আর রাজপুত্রকে সে পথে দেখিতে পাইল না।

এই ভাবে বছর দুই চলিয়া গেল। সখীরা জিজ্ঞাসা করিল "দেবভক্তির প্রথম সোপান স্বামিভক্তি" ভুলে গেছ কি?

একতা নম্রমুখে উত্তর করিল, না ভুলি নাই।

সখীগণ কহিল, হৃদয়মন্দিরে দেবতা স্থাপন কবে হইবে?

একতা গম্ভীরস্বরে উত্তর করিল, এ হৃদয় শূন্য নহে। সখীগণ বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে বার বার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিল

"দেখিলাম যেন কোন দেবের কুমার"
অলক্ষ্যে পশিল আসি হৃদয়ে আমার"।
সঙ্গীতে একতা সখীদের প্রশ্ন পূরণ করিত।

প্রকাশ্যে মনোভাব ব্যক্ত করা একতার স্বভাবসিদ্ধ নয়। স্বামী পাইয়াছে, তাঁহাকে হৃদয়-সিংহাসনে স্থাপন করিয়া পূজা করিতেছে, বাহ্য জগতের অনিত্য সুখে তাহার আন্তরিক স্পৃহা ছিল না, তার পিতা মাতার অবাধ্যতাচরণ করার কারণ এই। এই ভাবে দিন যাইতেছে, হঠাৎ এক দিন ভোর বেলায় ভীষণ হাহাকার রবে গ্রাম কম্পিত হইল। অচিরে সংবাদ আসিল, এ সংবাদ একতার কুটীরেও পহুছিল—"কুমার রাজসিংহ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন"। এ সংবাদ শুনিয়া একতা ব্যতীত সে কুটিরে আর কাহারও কিছু হইল না।

বেলা ৭টার সময় কুমার রাজসিংহের চিতানল ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। চারি পাশে পিপীলিকাশ্রেণীবৎ লোক দণ্ডয়মান। গঙ্গা-বারি কম্পিত করিয়া প্রভাতের বাতাস হু হু করিয়া বহিতেছে। ওই পূর্ব্বাকাশে বালারুণ আজ অস্ফুট, ম্লান। এই বার এক ঝাপ্টা বাতাসে চিতার আগুন দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিল, এমনি সময় স্বর্গের. দেবীর মত একজন রমণী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল এবং সেই স্থানের সহস্র সহস্র মানব সন্তানকে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ করিয়া সেই রাজকুমারের প্রজ্বলিত চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। রমণীর শরীরে নববিবাহিতার সাজ—হৃদয়ে কুমার রাজসিংহের ছবি। এ অদ্ভুত রহস্য আর কেহ বুঝিল না, বুঝিল কেবল সেই দাসী।

শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী দাস।

নূতন সংবাদ।

১। আগামী জুন মাসে ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজত্বকালের ৬০ বর্ষ পূর্ণ হইবে। এতদুপলক্ষে একটী মহোৎসবের আয়োজন হইতেছে।

২। খ্যাতনামা স্বর্ণকার বাবু শ্রীকৃষ্ণদাস ময়ূরভঞ্জ রাজার জন্য একছড়া হার প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার মূল্য বাইশ হাজার টাকা। ইহাতে আটচল্লিশ খানা হীরা বসান আছে।

৩। চীনমন্ত্রী লিহুন চাঙ্গের স্ত্রীর এক হাজার পরিচারিকা। পঞ্চাশ প্রকারে তাহার কেশবিন্যাস হয়। তাঁহার দুই-হাজার রকমের পোশাক আছে। চীনে এত বড় ধনী স্ত্রীলোক আর নাই, কিন্তু তথাপি তিনি স্বয়ং সংসারের হিসাব পত্র রাখিয়া থাকেন।

৪। এবার দার্জ্জিলিঙে এত বৃষ্টি হইয়াছে যে, অনেক স্থলে পাহাড় ধসিয়া পড়িয়াছে। ঝড়ও অতি প্রবল হইয়াছে।

৫। এত দিন হিন্দুদিগের চিতাভস্ম

ধাপায় নিক্ষিপ্ত হইত। কলিকাতায় নিমতলা ও কাশীমিত্রের ঘাট হইতে চিতাভস্ম লইয়া সাগরে নিক্ষেপ করা হইবে, এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে শুনিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

৬। মজঃফরপুরের উত্তরাংশে গণ্ডক নদীর উপরে একটি প্রকাণ্ড ভাসমান সেতু নির্ম্মিত হইতেছে।

৭। রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর দিয়া কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত ষ্টীম ট্রামওয়ে চলিবে।

বামারচনা।

খোকার হাসি।

আনিও না ও'রে নিকটে আমার,
ও'বড় সময়-চোর;
হাসিতে খেলিতে; খেলিতে হাসিতে,
বেলা ব'য়ে যায় মোর!
কি জানি কি আছে ও চাঁদ বদনে
চাহিলে মোহিত হই,
আবেশে অবশ আকুলনয়নে
অনিমেষ চে'য়ে রই।
লহরে লহরে অমৃত সঞ্চরে—
তনু মন পুলকিত।
ছোট দু'টী হাতে কে'ড়ে নিয়া যায়
আমার উদাস চিত!
স্নেহ মমতার দারুণ নিগড়ে
বাঁধিয়াছে প্রাণ মোর,
ছয় মাস কাল না হইতে গত
এ হ'ল বিষম চোর।
প্রাণ চুরি করে, মন চুরি করে,
বিষাদ.হরিয়া নেয়,
বিনিময়ে শুধু একটুকু হাসি
সুধা মে'খে ঢে'লে দেয়!

ও—একটী কণিকা হাসির লাগিয়া
ব্রহ্মাণ্ড ত্যজিতে পারি,
জগতের যত আনন্দ উল্লাস
চরণে লুটায় তারি।
হাঁরে! শিশু চোর! কেমন সাহসে
পরাণের ঘরে গিয়া,
প্রাণ চুরি কর হাসিতে হাসিতে
ছোট দুটী হাত দিয়া?
এ'বয়সে তুই যদি রে এমন!
কেমন হইবি পরে?
যত ভাবি তোর ভবিষ্য ভাবনা,
বিষাদে নয়ন ঝরে!
বুঝি এত হাসি, এত রঙ্গলীলা
র'বে না র'বে না তোর,
নয়নের কোণে শুকা'য়ে মরিবে
মোহের মোহন ঘোর।
এ' অমৃতরাশি ফুরাবে তোমার
তৃষায় জ্বলিবে প্রাণ,
সারাটী জীবন অবসান হবে
গাহিয়া খেদের গান!

শ্রীমতী শ।

No. 379. August, 1896.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৭৯ সংখ্যা। | শ্রাবণ, ১৩০৩—আগষ্ট, ১৮৯৬। | ৬ষ্ঠ কল্প। ১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মাদাগাস্কারের পরিণাম—কিছুদিন হইল ফরাসীরা মাদাগাস্কার দ্বীপ জয় করেন। ফরাসী (সেনেট) মহাসভার আদেশে ইহা একটী ফরাসী উপনিবেশ বলিয়া গণ্য হইবে।

দান—ডাক্তার এস, কে, বর্ম্মন্ কলিকাতার দেশীয় মেডিকাল কলেজে (College of Physicians and Surgeons of Bengal) ১০ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। অন্যান্য ধনাঢ্য দেশহিতৈষিগণেরও এই শুভ কার্য্যের সহায়তা করা কর্ত্তব্য।

শ্যালিকা-বিবাহ—ইংলণ্ডের লর্ড সভার অধিকাংশ সভ্যের মতে শ্যালিকা-বিবাহ সম্বন্ধীয় আইনের পাণ্ডুলিপি গৃহীত হইয়াছে। যুবরাজ ও রাজবংশের অনেকে ইহার প্রবল সপক্ষ।

বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক—অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র বসু নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য ইংলণ্ডীয় বৈজ্ঞানিক সভা হইতে বিজ্ঞান-ডাক্তার উপাধি পাইয়াছেন। ইংলণ্ডে একটী বৈজ্ঞানিক মহাসভা হইবে, জগদীশ বাবু তথায় উপস্থিত হইবার জন্য গত ২১এ জুলাই সস্ত্রীক বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে প্রেরণ করিতেছেন।

নূতন রেলওয়ে—ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত রেল আছে। এখন ময়মনসিংহ হইতে জামালপুর পর্য্যন্ত ইহা বিস্তারিত হইবে। রেলপথ ৪০ মাইল বাড়িবে।

ব্রজমোহন দত্ত পারিতোষিক—১৮৯৬-৯৭ সালের পারিতোষিক রচনার মূল্য ৪০ টাকা। বিষয় "একান্নবর্ত্তী হিন্দু-পরিবারভুক্ত স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য", ইহার

বিশেষ বিবরণ বিজ্ঞাপনে দ্রষ্টব্য। শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দাসী ও কুলবালা দেবী গত দুইবারের রচনার জন্য ৮০ ও ৪০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

কালা বোবা বিদ্যালয়—আমেরিকায় এক কালা-বোবা রমণীর উদ্যোগে কলিকাতা কালা-বোবা বিদ্যালয়ের জন্য প্রায় ৫০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার অন্যতম শিক্ষক বাবু যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গালডেট কলেজ হইতে ডিপ্লোমা পাইয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তথা হইতে আগামী শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হইতে নিম্ন শ্রেণীর লোক পর্য্যন্ত সকলের তিনি প্রিয়পাত্র হইয়াছেন।

রাজবিবাহ—গত ২২এ জুলাই যুবরাজের তৃতীয়া কন্যা প্রিন্সেস্ মডের সহিত ডেন্মার্কের রাজপুত্র প্রিন্স চার্লসের শুভ বিবাহ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। মহারাণী স্বয়ং বিবাহস্থলে উপস্থিত হইয়া তাহার শোভা বর্দ্ধন করেন।

নব্যা রমণী—কেবল আমাদের দেশের প্রাচীন তন্ত্রের লোকেরা স্ত্রীজাতির উন্নতির বিপক্ষ নহেন। সম্প্রতি আমেরিকার পেটার্স ইষ্টন নামক পাদরী নব্যা মহিলাকে চক্ষুশূল মনে করিতেছেন। তাঁহার মতে স্ত্রীলোক পুরুষের সম্পূর্ণ অধীন, স্ত্রীলোকের অধিকার কথাটা (বাইবেল) শাস্ত্রবিরুদ্ধ, (খৃষ্টান) ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং পৈশাচিক। বিজ্ঞ খৃষ্টানগণ কি বলেন?

রুষীয় সাম্রাজ্ঞী—ইনি অল্পবয়স্কা ও স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা হইলেও প্রজা-বৎসলা। দেশের গরিবদের সাহায্যার্থ আইন করিবার জন্য সমিতি হইয়াছে। তিনি তাহার শীর্ষস্থানে থাকিয়া ‘দীনে দয়া’ প্রকাশের বিশেষ সুব্যবস্থা করিতেছেন।

সৃষ্টি-প্রক্রিয়া রহস্য।

(৩৭০ সংখ্যা—২১৭ পৃষ্ঠার পর)

তন্ত্রে যে চতুর্ব্বিধ সৃষ্টি, অর্থাৎ যৌগিক সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আরও বিশদ করিয়া বর্ণনা করা যাইতেছে।

অদৃষ্টনিবন্ধন জীবসমষ্টির ভোগকাল উপস্থিত হইলে যখন আদ্যা শক্তিতে (প্রকৃতিতে) গুণক্ষোভ হয়, তৎকালে তমোগুণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঐ চৈতন্যযুক্ত শক্তিও ঐ তমোগুণে অনুপ্রবিষ্ট হয়েন। এই তমোগুণ মহাকাল শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। যৎকালে প্রলয় কাল উপস্থিত হয়, তৎকালে সত্বগুণ রজোগুণে এবং রজোগুণ তমোগুণে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই তমোগুণও প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। তন্ত্রে যে কথিত আছে, আদ্যা কালী মহাকালকে প্রসব করিয়া তাঁহাতে

উপগতা হয়েন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আদ্যা শক্তি হইতে আবির্ভূত তমোগুণে আদ্যা শক্তি অনুপ্রবিষ্টা হইতেছেন। স্ত্রী পুরুষ সহযোগে যেরূপ জীবসৃষ্টি হয়, সেইরূপ মহাকাল সহযোগে আদ্যা শক্তি হইতে জগৎ সৃষ্ট হইতেছে। বৈষ্ণবেরা এই আদ্যা শক্তিকে রাধিকা বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কথিত আছে যে, গোলোকে রাসমণ্ডলে রাধিকা একটী অণ্ড প্রসব করিয়াছিলেন; সেই অণ্ড হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর উৎপন্ন হয়েন। এই অণ্ড শব্দের লক্ষ্য মহত্তত্ব। মহত্তত্বই সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ভেদে বিভক্ত হইয়া সূক্ষ্ম ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। এ স্থলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, আমরা যে তমোগুণকে মহাকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তিনিই বৈষ্ণবদিগের নবীননীরদ-দ্যুতি কৃষ্ণ, গোলোকে নিত্য রাসলীলা করিতেছেন। রাসলীলার অর্থ গুণভেদে বহুরূপা শক্তি সহযোগে সৃষ্টি। গোলোকের অর্থ অসীম ব্রহ্মমণ্ডল।

অনন্তর প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইলে তৎপ্রসূত মহাকাল সহকারে তাঁহা হইতে নাদের (মহত্তত্বের) উৎপত্তি হয়। এই নাদ আবার সত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণভেদে ত্রিবিধ হইয়া থাকে। ইহাদিগকে সূক্ষ্ম ব্রহ্মা, সূক্ষ্ম বিষ্ণু ও সূক্ষ্ম মহেশ্বর বলিয়া থাকে। অনন্তর ত্রিবিধ নাদ হইতে সাত্বিক বিন্দু, রাজসিক বিন্দু ও তামসিক বিন্দু এই ত্রিবিধ বিন্দুর উৎপত্তি হইয়াছে। এই তিনের যে সমষ্টি, তিনি পরম বিন্দু শব্দে অভিহিত হয়েন। এই বিন্দু বীজ ও নাদের মধ্যে বিন্দু শিবরূপ অর্থাৎ চিন্ময়, বীজ শক্তিরূপ অর্থাৎ প্রকৃতিময় এবং নাদ উভয়াত্মক অর্থাৎ শিবশক্তির সমবায় স্বরূপ। ফলতঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে সত্বগুণ চিন্ময়, তমোগুণ প্রকৃতিময়, এবং রজোগুণ উভয়াত্মক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। অনন্তর বিন্দু হইতে রৌদ্রী শক্তি, নাদ হইতে জ্যেষ্ঠা শক্তি এবং বীজ হইতে বামা শক্তি উৎপন্ন হইলেন। এই রৌদ্র শক্তি হইতে রুদ্র, জ্যেষ্ঠা শক্তি হইতে ব্রহ্মা এবং বামা শক্তি হইতে বিষ্ণু উৎপন্ন হইয়াছেন। এই ত্রিবিধ শক্তিকে ইংরেজদের বাইবেল ধর্ম্মপুস্তকে (Father, Son and Holy Ghost) পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা কহেন।

পূর্ব্বে যে ত্রিবিধ মহত্তত্বের কথা (ইংরাজিতে Doctrine of Trinity) উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এবং ত্রিবিধ বিন্দু ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বীজ মাত্র। এই ক্ষণে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর নিজ নিজ স্বরূপে পরিণত হইলেন।

এই রুদ্র জ্ঞানশক্তি স্বরূপ, ব্রহ্মা ইচ্ছাশক্তি স্বরূপ ও বিষ্ণু ক্রিয়াশক্তি স্বরূপ। রুদ্র বহ্নি স্বরূপ হইয়া সংহার করেন, ব্রহ্মা চন্দ্র স্বরূপ হইয়া সৃষ্টি করেন এবং বিষ্ণু সূর্য্যস্বরূপ হইয়া জগতের পোষণ করিয়া থাকেন।

বিন্দু শিবাত্মক, বীজ শক্ত্যাত্মক ও নাদ

শিবশক্ত্যাত্মক। এই বিন্দু, বীজ ও নাদ হইতে ত্রিশক্তি অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। মূল প্রকৃতির সহিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের যেরূপ কোন ভেদ নাই এবং উভয়ে যেমন তদাত্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া আছেন, সেইরূপ জ্ঞানশক্তির সহিত ব্রহ্মা এবং ক্রিয়াশক্তির সহিত বিষ্ণু তদাত্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।

জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, গৌরী, ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবী নামে বিখ্যাত। এই তিন শক্তি হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইঁহারা শক্তি ব্যতিরেকে কেহই কোন কার্য্য করিতে সমর্থ নহেন। বস্তুতঃ শক্তিসমবেত ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, শক্তিসমবেত বিষ্ণু পালন করেন, শক্তিসমবেত রুদ্র সংহার করিয়া থাকেন। শক্তি ব্যতিরেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে যেরূপ জড় বলা যায়, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ব্যতিরেকে শক্তিকেও সেইরূপ জড়স্বরূপ বলা যাইতে পারে, কারণ শক্তি ও শিব পরস্পর পৃথক্ হয়েন না, উভয়ের পরস্পর-অধীনভাব সম্বন্ধ মূল প্রকৃতি হইতে জগতের চরম-সৃষ্টি পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বে যে গুণভেদে ত্রিবিধ বিন্দুর উল্লেখ হইয়াছে, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক বিন্দুর নাম বিন্দু, রাজসিক বিন্দুর নাম নাদ, এবং তামসিক বিন্দুর নাম বীজ। বীজ হইতে প্রথমতঃ শব্দতন্মাত্রের সৃষ্টি হয়। শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, আকাশ হইতে স্পর্শতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু, বায়ু হইতে রূপতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র হইতে তেজ, তেজ হইতে রসতন্মাত্র, রসতন্মাত্র হইতে জল, জল হইতে গন্ধতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, এবং পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।

এই যে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীর উল্লেখ করা হইল, ইহারা প্রত্যেকেই পরস্পর বিশ্লিষ্ট ও অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ভূতমাত্র। পরে ত্রিবৃৎকরণ ও পঞ্চীকরণ হইলে ইহাদের সূক্ষ্মাংশ পরস্পর মিলিত হইয়া স্থূল ভূত রূপে পরিণত হয়। আপাততঃ বিন্দু, তন্মাত্র, অপঞ্চীকৃত ভূত ও পঞ্চীকৃত ভূতের পরস্পর বিভেদক একটী সামান্য লক্ষণ বলা যাইতেছে। যাহার দীর্ঘতা নাই, প্রস্থ নাই ও বেধ নাই, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে বিন্দু কহে। যাহার দীর্ঘতা আছে, প্রস্থ ও বেধ নাই, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে তন্মাত্র বলে। যাহার দীর্ঘতা আছে, প্রস্থ আছে অথচ বেধ নাই, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে অপঞ্চীকৃত ভূত বলা যায়। যাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ এই তিনটী আছে, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে পঞ্চীকৃত ভূত বলা যায়।

বীজ হইতে যেরূপ আকাশের সৃষ্টি

হইল, সেই সময় সেইরূপ নাদ হইতে বাগিন্দ্রিয় ও শব্দশক্তির এবং বিন্দু হইতে শ্রবণেন্দ্রিয় ও শব্দজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ হইতে বায়ুসৃষ্টির সমকালে নাদ হইতে পাণীন্দ্রিয় ও স্পর্শশক্তির এবং বিন্দু হইতে ত্বগিন্দ্রিয় ও স্পর্শজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ হইতে তেজের সৃষ্টিসময়ে নাদ হইতে পাদেন্দ্রিয় ও তৈজস শক্তির এবং বিন্দু হইতে দর্শনেন্দ্রিয় ও রূপজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ অর্থাৎ তামসিক বিন্দু হইতে জলের সৃষ্টিসময়ে, নাদ অর্থাৎ রাজসিক বিন্দু হইতে পায়ু ইন্দ্রিয় ও রসশক্তির এবং সাত্বিক বিন্দু হইতে রসনেন্দ্রিয়, ও রসজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ হইতে পৃথিবীর সৃষ্টিসময়ে, নাদ হইতে জননেন্দ্রিয় ও গন্ধশক্তির এবং বিন্দু হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও গন্ধজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইক্ষণে সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, আকাশাদি পঞ্চভূতের অবস্থা চতুষ্টয়ের ন্যায়, বাক্‌শক্তি ও শব্দজ্ঞান প্রভৃতিরও তন্মাত্রাদিক্রমে অবস্থা চতুষ্টয় হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

অসভ্য জাতির বিবরণ।

পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রো মাতারা শিশুদিগকে পৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া রাখে। ছেলে অত্যন্ত অস্থির হইলে মা দ্রুতগতিতে চলিয়া বেড়ায় ও তাহাতে শিশু ঘুমাইয়া পড়ে। মাতা শস্য চূর্ণ করে, মাথায় মোট বহিয়া লইয়া যায় এবং অন্যান্য সকল কার্য্যই করিয়া থাকে, অথচ ছেলে যেমন পিঠে বাঁধা, সেইরূপই থাকে। সন্তানের বয়স দুই বৎসর হইলে সে আর মাতৃস্তন্য পান করে না। মা আপনার ছেলেটীর মুখমণ্ডলে যত্নপূর্ব্বক উল্কি অঙ্কিত করেন, তদ্দ্বারা সন্তান কোন্ বংশোৎপন্ন তাহা বুঝিতে পারা যায়। কোন না কোন দেবতার নামে সন্তানের নামকরণ হইয়া থাকে। ইফা এক প্রধান দেবতা, অনেক স্থলে তাঁহার নামানুসারে নাম হয়। দশ বৎসরের ন্যূন বয়সে কোন সন্তান মরিলে জঙ্গলে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে দণ্ডিত করা হয়। দেশীয় লোকদিগের বিশ্বাস যে, যে ছেলে অল্প বয়সে মরে, তাহাকে পিশাচে ধরিয়া লোকান্তরে লইয়া যায়। কোন ছেলে রোগা হইলে ইহারা মনে করে, সহচর দুষ্ট ভূত ইহার আহার অপহরণ করিতেছে। এই ভূতদিগের তৃপ্তিসাধনের জন্য বলি দেওয়া হয়, ভূতদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য সন্তানের গলায় ঔষধ বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার পায় কতকগুলি লোহার আংটি পরাইয়া দেওয়া হয়। চলিতে চলিতে আংটি সকল যখন বাজিতে থাকে, তখন তাহারা

মনে করে, সেই শব্দে ভূতেরা পলাইতেছে। দুরন্ত ছেলে মরিলে মা তাহার গায়ে একটী দাগ কাটিয়া দেয়, আর একটী সন্তান হইলে সেই দুরন্ত ছেলে ফিরিয়া আসিল কি না বুঝিতে পারে।

বালিকাদিগের কর্ণে ছিদ্র করা হয়। কোন কোন স্ত্রীলোক নাসিকায় ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে একখণ্ড কাষ্ঠ বা একটী পালক প্রবিষ্ট করিয়া দেয়। ইহারা মাথায় এক প্রকার কণ্ঠহার পরে এবং হাতে কাচ বা পিত্তলের বাজু পরিধান করে। ১৫।১৮ বৎসর হইলে কন্যাদিগের বিবাহকাল উপস্থিত হয়। বর কন্যার পিতা মাতা বা বন্ধুদিগকে বিবাহের পণ দিয়া থাকে। বালিকারা বা বয়ঃস্থা স্ত্রীলোকেরা সরু সরু বিগনি করিয়া চুলের শোভা প্রকাশ করে। ইহাতে অনেক সময় ব্যয় হয়। বাটীতে ভাল করিয়া চুলের বিগনি না হইলে বাজারে গিয়া সেখানে কয়েক কড়া কড়ি দিলে ব্যবসায়ীরা সুন্দর করিয়া কেশবিন্যাস করিয়া দেয়। পুরুষেরা নাপিতের কাছে গিয়া ত্রিকোণ বা চৌকোণ, নানা আকারে মস্তক খেউরি করে; কখনও কখনও এককালে নেড়া হয়।

পশ্চিম আফ্রিকার অনেক স্থানে কড়িই একমাত্র অর্থ। কুড়ি হাজার কড়ির মূল্য ৫৲ টাকা এবং এইরূপ কড়ির এক একটী মোট করিয়া অর্থসংখ্যা গণনা করা হয়। নিগ্রোরা অত্যন্ত গীতবাদ্যপ্রিয়। সূর্য্যাস্তের পর এই আমোদ আরম্ভ হইয়া থাকে। মাদল প্রধান বাদ্যযন্ত্র, তাহাদের নৃত্য অনেক প্রকার। কখনও কখনও এক ব্যক্তি দুইটা কাষ্ঠদণ্ডের উপরে দাঁড়াইয়া চলিয়া চলিয়া নৃত্য করিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

পুরস্কার।

১

উপরে অনন্ত নীলাকাশ,
ভূতলে অনন্ত পারাবার,
তার মাঝে নীল জল ছুটিতেছে অবিরল,
নরের আশার সম,
সীমা নাহি তার!

২

তীরে, তরু-পত্র-রাজি-তলে
—জাগে মোর নীরব কুটীর,
প্রাঙ্গণে সে সন্ধ্যাবেলা মৃগশিশু করে খেলা,
চঞ্চলচরণ, চারু
চিত্রিত-শরীর!

৩

তেয়াগিয়া মানবের দেশ,
এ বিজনে আচরি সন্ন্যাস;
অশান্তিরে রাখি দূরে আসিয়াছি শান্তিপুরে,
এবে সদা কাণে শুনি
কালের সন্তাষ!

৪

মানবের পরিচিত মুখ,

স্বার্থ-স্নেহ-জড়িত হৃদয়,

ক্রমে তা যেতেছি ভুলে, আজি পশুপাখি-কুলে

ভাল বাসি—চাহি না, এ

প্রীতি-বিনিময়।

তবে,

একাকী, মা প্রকৃতির লীলা

দেখিতে কাহার মন লাগে?—

তাই স্মরি লোকালয়!—কিন্তু সে যে বিষ-ময়!

মুক্ত পাখী—ছিছি! কভু

বন্দি-দশা মাগে?

৬

একদিন ভাসিলে চন্দ্রমা,

সাগরের সোণার উরসে,

হাসিল আকাশ ধরা, সহসা দিগন্তভরা

গীতি-সুধা কোথা হ'তে

শ্রবণেতে পশে।

৭

যেন সত্য পরীর সঙ্গীত!

শুনি হিয়া উঠিল শিহরি,

দেখিনু বিটপি-মূলে অদূর জলধিকূলে,

ছুটায় বালিকা এক

পীযূষ-লহরী!

৮

বিস্ময়-আনন্দে প্রাণ মম,

পূরিল! নিরখি তার মুখ,

ধীরে ধীরে পা' টিপিয়া, দাঁড়াইনু কাছে গিয়া,

পাছে তার গান ভাঙে—

ভয়ে কাঁপে বুক!

৯

উছলে বিশ্বাস সরলতা,

তার আঁখি-নীলপদ্ম দিয়া,

উন্নত আননে মেয়ে শূন্যপানে আছে চেয়ে,

বিশ্বের সৌন্দর্য্য যেন

রয়েছে জমিয়া!

১০

যতক্ষণ গাহিল বালিকা,

রুদ্ধশ্বাসে রহিনু কেবল,

প্রতি তান প্রতি লয়ে, প্রাণে যায় স্রোত ব'য়ে,

ধমনীর উষ্ণ রক্ত

হ'য়ে যায় জল!

১১

যখন ভাঙ্গিল তার গান,

ভুলে আমি আপনা তখন,

দু'হাতে সে মুখ ধরি, দেখিলাম—মরি! মরি!

সোণার ললাটে দিনু

একটী চুম্বন!

১২

সুধিলাম—কে গো তুই বাছা!

কোন্ মা'র সরবস্ব ধন?

"মা, বাপ, ভগিনী ভাই, আমার কেহই নাই।

সংসারে আমার নাই আপনার জন!"

কহিল সে কচি মুখে,

সজল নয়ন!

১৩

সংসারে কেহই তোর নয়
—সংসার কি এতই নিঠুর?
আছে বটে বজ্র তথা, হিংসা দ্বেষ কপটতা!
তোরেও বাসে না ভাল?—
এত কি সে ক্রূর?

১৪

তোর যদি কেহ নাহি হায়!
আমি তবে কেন বেঁচে র'ব?—
আয়! হৃদি পসারিয়া, রাখি তোরে লুকাইয়া,
কেউ নাই তোর যদি,
আমি তোরি হ'ব!

১৫

"সন্ন্যাস" থাকুক সিন্ধুজলে
তোরে নিয়ে হইব সংসারী,
তোরে বাছা! বুকে নিলে, তপস্যার ফল
মিলে!
মূর্ত্তিমতী মুক্তি, আহা!
তুই মা! আমারি!

১৬

তোর তরে আনন্দে ফিরিব,
পরিত্যক্ত মানব-দুয়ার,
জীবনের সন্ধ্যাক্ষণে দেখি যদি চন্দ্রাননে
ভাসিছে সুধার হাসি
স্নেহ-প্রতিমার,
সে যে শত স্বর্গ-সুখ, ভাবিতে উথলে বুক।
অভিশপ্ত জীবনে সে
দেব-পুরস্কার!!

শ্রী মাঃ।

আব্বাসা।

যাঁহারা আরব্য উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট হারুণ আল্ রসেদের নাম অপরিচিত নহে। ইনি এক সময়ে বোগদাদের সিংহাসন সমলঙ্কৃত, এবং উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় স্বীয় সদ্‌গুণসৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়াছিলেন। আব্বাসা এই হারুণ আল-রসেদের সহোদরা। ইনি যে কেবল নিরতিশয় রূপবতী ছিলেন, এমন নহে; বিদ্যা ও বহুল সদ্‌গুণ ইঁহার স্বাভাবিক লাবণ্যকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এই হেতু তাঁহার সহোদর তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। হারুণ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, স্বীয় ভগিনীর তদধিক কোন গুণশালী যুবকের সহিত বিবাহ দিবেন। কিন্তু তৎকালে সেরূপ সুপাত্রের অভাব নিবন্ধন, সহোদরার সমকক্ষ বিদ্যাকুশল তদীয় অমাত্য জিয়া-ফারের সহিত তাঁহার পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া দেন। উদ্বাহকালে হারুণ জিয়াফারকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার এই গুণবতী ভগিনী অদ্য হইতে তোমার ধর্ম্মপত্নী হইলেন, ইঁহার সদ্‌গুণ সকল যাহাতে

আরও পরিস্ফুট ও পরিবর্দ্ধিত হয়, তুমি যাবজ্জীবন তাহার চেষ্টা করিবে। তুমি আব্বাসাকে তোমার কেবল সেবিকা মনে করিও না।” কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জিয়াফারের মানসিক স্রোত বিভিন্নমুখী হওয়ায় এবং হারুণের অনুরোধ অনুযায়ী কার্য্য না করায়, হারুণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং জিয়াফারের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। পতিব্রতা আব্বাসা স্বামীর নিরতিশয় পক্ষপাতিনী ছিলেন। সহোদরের নিষ্ঠুর আদেশের প্রতিবাদ করাতে তিনিও নির্ব্বাসিতা হইলেন। সহোদর কর্ত্তৃক দুরীকৃতা হইয়া আব্বাসা ভিখারিণী-বেশে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইনি বহুসংখ্যক সঙ্গীত রচনা করেন। সকল সঙ্গীতই শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ। প্রিয় পতির বিরহে ইনি কিরূপ শোকাতুরা হইয়াছিলেন, ঐ সকল সঙ্গীত পাঠ করিলে তাহা সহজে অনুমিত হয়। আব্বাসা স্বীয় মাতৃভাষায় দুঃখপূর্ণ আত্মজীবন-কাহিনী কবিতাতে বিবৃত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা এরূপ মর্ম্মস্পর্শিনী যে, পাঠ করিলে অশ্রুপাত না করিয়া থাকা যায় না। পতির প্র[illegible] সতী আব্বাসার উক্তি ও তচ্ছন্দেশে রচি[illegible] শোক-গাথা বেন আবন্ হাইডা (Ben Abon Haydah) কর্ত্তৃক লিখিত এক-খানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। আব্বাসা দুই পুত্র প্রসব করেন। জিয়াফারের মৃত্যুর পূর্ব্বে যমজ পুত্রদ্বয়কে অধ্যয়নার্থ মক্কা নগরীতে গোপনে প্রেরণ করেন।

আব্বাসা ৭৮৬ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। অতি প্রাচীন কালে মুসলমান-গণের মধ্যেও যে স্ত্রীশিক্ষার বিশিষ্টরূপ আদর ছিল এবং মুসলমানসমাজেও যে বিদুষী রমণীর অপ্রতুল ছিল না, আব্বাসা-প্রমুখ বিদ্যাবতী নারীরা তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ হালদার।

শান্তি-নিকেতন।*

রোগাক্রান্ত, পথশ্রান্ত! চল শান্তি-
নিকেতনে।
পা'বে শান্তি
যা'বে শ্রান্তি
শুভ দেবদরশনে।
জুড়াও পরাণখানি ক্ষণেক ছাতিম-তলে।
হ'বে লাভ সিদ্ধি,
পা'বে শুভ বুদ্ধি,
বস ধ্যানেতে বিরলে।
হের, তরুরাজি সাজি শোভে সুন্দর প্রসূনে।

* বোলপুর শান্তিনিকেতন শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাধনার স্থান ছিল। এখন তিনি তাহা ধর্ম্মসাধকদিগের সাধনার জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন। ৭ই পৌষ এখানে একটী মহোৎসব হয়।

পীকফুল তায়,
সুখে গান গায়,
বিমোহিত বিভুগুণে।
...পেতে হয়েছে হের হের রে অধরা ধরা।
মরুত ব্যজন,
করে প্রতিক্ষণ,
জুড়া'তে কাতরা।
জলদ এখনি তুষিবে ধরণী স্নিগ্ধ বারি দানে।
জুড়াইতে কায়া,
ডাকে মায় হিয়া,
ভকত সন্তানে।
যেথানে মা, ঠাণ্ডা হ'বে তথা, সন্তান নিশ্চয়।
না হ'লে বুঝিব,
বেদনা পাইব,
ভকত সে নয়।
পউষে হরষে যাও মাতৃ-সন্নিধানে ভাই।
কর উৎসব,
মিলি ভাই সব,
ভিক্ষা তব ঠাঁই।

তিব্বতীয় জাতির মতে মানবের উৎপত্তি।

মানবের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তিব্বৎ দেশের ইতিবৃত্তে বর্ণিত আছে যে, অতি প্রাচীন কালে এই পৃথিবী জলগর্ভে নিহিত ছিল, ক্রমে উপরে উত্থিত হইল। এই পৃথিবী পাঁচটী দেশে বিভক্ত হইল। সেই পাঁচটী দেশের নাম ভারতবর্ষ, চীন, হর (কাবুল, পারস্য ও তুর্কিস্থান ইহার অন্তর্নিবিষ্ট), মঙ্গোলিয়া এবং তিব্বত। ভারতবর্ষে দেবতারা বাস করিতেন। ইঁহাদের ভাষা সংস্কৃত; এই জন্য সংস্কৃত ভাষা দেবভাষা নামে কথিত। চীনদেশ নাগ বা সর্প বংশের আবাসস্থান ছিল। "ড্রেগন" নামক নাগ ঐ সর্পকুলের রাজা ছিলেন। এই হেতু চীনসম্রাট্ অদ্যাপিও এই নাগরাজের পূজা করিয়া থাকেন এবং নাগরাজ-চিত্রিত বৈজয়ন্তী ধারণ করিয়া থাকেন। হর-দেশে অসুরগণ বাস করিত। এই অসুর সকল সর্ব্বদা ভারতবর্ষীয় দেবগণের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিত। সুতরাং ইহাদের উৎপীড়নে দেবরাজ ইন্দ্র অনেক সময়ে শান্তিতে রাজত্ব করিতে পারিতেন না। মঙ্গোলিয়া দেশে শ্রীনপো নামক রাক্ষস-জাতি বাস করিত। ইহারা সর্ব্বপ্রকার মাংস আহার করিত, কোন শস্য কখনও স্পর্শ করিত না। তিব্বতদেশ বানর জাতি কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমান কল্পের প্রারম্ভে, যখন মহাজল-প্লাবন অন্তর্হিত হইল, সমস্ত জলরাশি উপত্যকা হইতে সরিয়া নদনদী দিয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিল, তখন পৃথিবীতে তরু লতা দেখা দিল নিসর্গ সুন্দরী বিবিধ পাদপরাজিতে বিভূষিত হইয়া

মনোহর শোভা ধারণ করিল। মঞ্জুল কুঞ্জবন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতত্রীকুলের সুশ্রাব্য সঙ্গীতে মধুর হইয়া উঠিল। অরণ্যে আরণ্য জন্তু দেখা দিল। একদা মঙ্গোলিয়া দেশ হইতে স্রিন্‌পো-জাতীয়া এক সুরূপা রাক্ষসী আসিয়া তিব্বতদেশীয় চিঠাং উদ্যানে উপনীত হইলেন। এখানে এক বানরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রাক্ষসী ঠাকুরাণী মর্কট মহাশয়ের দেবভাবে মুগ্ধ হইয়া ইহাঁকে পতিত্বে বরণ করিলেন। কিন্তু কপিবর তাঁহার প্রস্তাবে সহজে সম্মত হইলেন না—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তখন স্রিন্‌পো সুন্দরী সাশ্রুলোচনে বলিতে লাগিলেন, "আমি স্বকর্ম্মবশে রাক্ষস-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমার একান্ত বাসনা, আপনি আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। যদি আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন, আমি নিশ্চয়ই আপনার সম্মুখে আত্মহত্যা করিব।" মর্কটদেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কর্ত্তব্য অবধারণ জন্য "চেনরিজিগের" শরণাপন্ন হইলেন। ইনি সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর। আকাশ হইতে প্রত্যাদেশ হইল;—"বৎস ইহার অভিলাষ পূর্ণ কর। ইনি তোমার পত্নী। তারার দেবভাব ইহাঁর অন্তর্নিহিত জানিবে।" উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল। মর্কটরাজ পত্নী লইয়া য়ারলা শাম্বু নামক এক তুষার-ধবল পর্ব্বতের কন্দরে বাস করিতে লাগিলেন। কালক্রমে স্রিন্‌পো সুন্দরী ছয় পুত্র প্রসব করিলেন। ছয় পুত্র আকার প্রকারে ছয় প্রকার হইল। ছয় সহোদরের মধ্যে কেহ কাহারও, এমন কি পিতা মাতারও সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইল না। কিন্তু সকলেই পিতার ন্যায় লোমশ ও লাঙ্গুলবান্ হইয়াছিল, এবং জননীর রক্তকান্তি তাহাদিগের মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হইয়াছিল। পুত্রগণ বয়োবৃদ্ধি-সহকারে যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল। পিতা বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে চেঠাং উদ্যানে প্রেরণ করিলেন। সন্তানবৎসলা জননীও তাহাদিগের অনুগামিনী হইলেন। পিতার তাড়না হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া ও জননীর নিকট আপনাদিগের স্বেচ্ছাচারের যথেষ্ট প্রশ্রয় পাইয়া বানরবৎসগণ মহানন্দে উদ্যানবিহারে দিন কাটাইতে লাগিল। স্রিন্‌পো সুন্দরী পুত্রগণের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ লইয়া চেঠাং উদ্যানে সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। অত্যল্প কালের মধ্যে বহু-সংখ্যক সন্তান সন্ততিতে গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। চেঠাং উদ্যানের ফল মূল ক্রমে ক্রমে নিঃশেষিত হইয়া গেল। আহার্য্যের অপ্রতুল ঘটিল। তখন পিতার কথা মনে পড়িল। সকলে জননীর সঙ্গে সেই গিরিকন্দরে উপনীত হইল। দেখিল পিতা ধ্যানমগ্ন। ক্ষুধার তাড়নায় তাহারা স্থির থাকিতে না পারিয়া উচ্চৈঃ-স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। পিতার ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি কি ব্যাপার জানিতে চাহিলেন। তাহারা বলিল, পিতঃ! আমরা অতিশয় ক্ষুধিত

হইয়াছি, আমাদের খাইবার কিছুই নাই, আপনি আমাদিগকে খাবার দিন"। সন্তানগণের এবম্প্রকার অবস্থা জানিয়া মর্কটরাজ সর্ব্বশক্তিমান্ চেনরিজিগ্‌কে স্মরণ করিলেন। চেনরিজিগ পরম দয়ালু বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে ছয় প্রকার শস্য পতিত হইল, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাদেশ হইল, "বৎস, এই শস্য গ্রহণ কর এবং তোমার সন্তানগণকে দেও, তাহারা যত পারে আহার করুক এবং অবশিষ্ট ক্ষেত্রে বপন করুক। এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বীজ হইতে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হইবে এবং তাহাতে যে প্রচুর পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন ফসল জন্মিবে, তদ্দ্বারা তোমার সন্তানেরা জীবন ধারণ করিবে।" তাহারা তাহাই করিল। কালক্রমে, ঐ শস্য আহারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের লাঙ্গুলের পরিমাণ হ্রাস ও গাত্রের লোম অন্তর্হিত হইতে লাগিল। অবশেষে আর লাঙ্গুল রহিল না। মর্কটরাজের এই ছয় সন্তান উত্তর কালে ছয় জাতীয় মনুষ্যের আদিপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এইরূপে মানবজাতির উৎপত্তি হইল। ক্রমে ক্রমে যখন সমগ্র পৃথিবী মানবজাতিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তখন দেবগণ তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন এবং সুমেরু পর্ব্বতের শিখর-দেশস্থ উদ্যানকে আপনাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন। হর-দেশের আদিম অধিবাসী অসুরগণ ঐ পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থান করিতে লাগিল। মঙ্গোলিয়ার রাক্ষসকুল মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহে বাস করিতে লাগিল। চীনের নাগবংশ ভূগর্ভে এবং নদ নদীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তিব্বতের মর্কটকুল হিমালয়ের গভীর জঙ্গলে লুক্কায়িত হইল। মানবজাতি মর্কটপিতা এবং মঙ্গোলিয়ার রাক্ষসী মাতা স্রিন্‌পো হইতে সমুৎপন্ন হওয়ায়, আমিষ ও নিরামিষ এই উভয়বিধ খাদ্য ইহাদিগের আহার্য্যরূপে পরিগণিত হইল। তিব্বতবাসিগণ বানর হইতে সমুৎপন্ন, ইহা তাহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। পৃথিবীর অন্যান্য মানবজাতির তুলনায় বানরের সহিত অধিক সাদৃশ্য আছে বলিয়া আপনাদিগকে নিরতিশয় গৌরবান্বিত মনে করে। তিব্বতবাসিগণের মতে তিব্বতই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ প্রদেশ এবং মানবজাতির জন্মস্থান; এবং মানবের আদিপিতা স্বর্গ হইতে প্রেরিত হইয়া তিব্বতদেশীয় চেঠাং উদ্যানে সর্ব্বপ্রথমে বাস করেন।

রমণীর আত্মদান।

আর্ম্মাণী দেশের একটী পর্ব্বতময় স্থানে এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যময় অভিনয় অভিনীত হইয়াছে। এমন সুন্দর, মহদ্ভাবপূর্ণ, এমন প্রেমময়-অমিয়ময় অভিনয় প্রাচীনকালে

এই ভারতে অভিনীত হইলেও বর্ত্তমান-কালে ইহা দুর্লভ এবং ইহার মহত্বে বর্ত্তমান সভ্য জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছে।

রমণীর আত্ম-উৎসর্গের জ্বলন্ত জ্যোতিঃ জগৎ অনেকবার দেখিয়াছে। পবিত্র ধর্ম্মের পবিত্র ভাবে বিমোহিত হইয়া রমণী আপন প্রাণকে উৎসর্গ করিয়াছে; সতীত্বের মহান্ ভাবে মাতোয়ারা হইয়া হাসিতে হাসিতে আপন প্রাণকে বিসর্জ্জন করিয়াছে, "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জননী জন্মভূমিকে অসুরাকৃতি ঘোর শত্রুর করাল কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য রণাঙ্গনে অসুরমর্দ্দিনীরূপে নৃত্য করিয়াছে তাহা দেখিয়াছি, কিন্তু আজ যে আত্ম-দানের কথা, পাঠিকা ভগিনি! তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছি, তাহার প্রকৃতি বিভিন্ন ও তাহার গঠন বিস্ময়পূর্ণ; তাহার অদ্ভুত দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়াছি। প্রেম কি জানি না, পবিত্রতা কি জানি না, স্বর্গের অমিয়ভাব কি জানি না, কিন্তু আজ এই আত্ম-উৎসর্গের ভাবে বিভোর হইয়া বুঝিতেছি যে, ইহার মধ্যে প্রেম, পবিত্রতা ও স্বর্গ বিরাজমান। তাই আজ প্রেমহীন আমরা বিজাতি বিধর্ম্মী হইলেও সেই আর্ম্মাণী নারীদিগকে দেবী-ভাবে স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রীরূপে পূজা করিতে বসিয়াছি। নয়নজলে তাঁহাদের শ্রীপদ অভিষিক্ত করিতেছি। ভক্তিহীন হৃদয় লইয়া ভয়ে ভয়ে পূজা করিতে যাইতেছি, কি জানি যদি মলিন হস্তে তাঁহাদের পবিত্র দেহ মলিন হয়! কি জানি, যদি স্বর্গের পারিজাত মর্ত্ত্যের বায়ুতে বিশুষ্ক হয়!

বেশী দিনের কথা নহে, বিগত বর্ষের আগষ্ট মাসের একদিন প্রভাতে সংবাদ আসিল, তুর্কিরা অসুররূপে নগরে প্রবেশ করিতেছে। রমণীগণের সতীত্ব নষ্ট করিতেছে। দলে দলে লাবণ্যময়ী ললনাকে ভোগের জন্য বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছে। গতকল্য রণক্ষেত্রে যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ সকলেই দেশের জন্য প্রাণ দান করিয়াছে। দেশমধ্যে অল্প-বয়স্ক বালক ভিন্ন আর কেহই নাই; আর উপায় নাই; কেহই সাহায্যকারী নাই, রক্ষাকর্ত্তা নাই। শত্রুর ঘোর গর্জ্জন ভীষণ ভাবে আকাশকেও নিনাদিত করিতেছে। এক দিকে ঘোর গর্জ্জন, অন্য দিকে বিকট উল্লাসধ্বনি দেশকে কাঁপাইয়া তুলিতেছে। সেই প্রলয়শব্দে পিতৃহীনা, পুত্রহীনা ও পতিহীনার অশ্রু শুকাইল, বদনমণ্ডলে কি জানি কেন, এমন কি জ্যোতিঃ খুলিল, নয়নে এমন কি এক জলন্ত ভাব উদ্ভাসিত হইল, হৃদয়ে এমন এক বৈদ্যুতিক তেজ প্রবেশ করিল যে, রমণী স্তন্যপায়ী শিশুকে দূরে অপসারিত করিয়া দিল, সুন্দর কুন্তল রাজি কাটিয়া ক্ষীণ কটিকে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিল। অনিন্দ্যরূপিণী রমণী নৃমুণ্ড-মালিনী অসুরমর্দ্দিনীর বেশে সজ্জিত হইল। শিশু সে ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। জগৎও সেই ভাবে স্তম্ভিত হইল। সকলের মুখে এক কথা; সকলের মনে এক ভাব।

কি! আমরা তুর্কির অপবিত্র হস্তে পবিত্র দেহ সমর্পণ করিব? তাহাদের বিলাসের পাত্রী হইব? উপরে পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বর আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। ভয় কি! প্রত্যেক গৃহে এই উদ্দীপনা ভাববিদ্যুতের ন্যায় শক্তি দান করিতেছে। সেই তেজে রমণী নাচিয়া উঠিতেছে। কেহই বলিতেছে না, কেহই ডাকিতেছে না, অথচ উন্মুক্ত জলস্রোতের ন্যায় একে একে দলে দলে, বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা এক অমিত তেজে উন্মত্তা হইয়া বহির্গত হইতেছে। রমণী শুনিয়াছে, তুর্কিরা আর্ম্মাণী রমণীমাত্রকেই আবদ্ধ করিতেছে, যুবতীর সতীত্ব প্রকাশ্যে নষ্ট করিতেছে, পশুদলের ন্যায় বদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছে! তাই আজ রমণী পিতৃশোক, ভ্রাতৃশোক, পতিশোক, পুত্রশোক তুচ্ছ করিয়াছে। তাই আজ দেবী দানবী হইয়াছে। অঙ্কশায়ী শিশু আজ আর কোমল ক্রোড়ে স্থাপিত নহে, দৃঢ়-রূপে পৃষ্ঠদেশে বদ্ধ। তাই আজ হাস্য-ময় প্রেমময় শিশুর চারুমুখের পানে স্নেহ-দৃষ্টি নাই, স্নেহপূর্ণ চুম্বন নাই। শিশু নিস্তব্ধ, জননী উন্মত্তা। এ দেব-ভাব না আসুরিক? কুসুমকোমলা বিদ্যুৎবরণী নারী চক্ষে জ্বলন্ত জ্যোতি, হৃদয়ে অমিত তেজ, হস্তে শাণিত অস্ত্র ধারণ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় নাচিতে নাচিতে বহির্গত হইল। আজ গৃহ সকল শূন্য, রাজপথে কেবল এই অসুরমর্দ্দিনীরূপিণী নারীরূপ। মধ্যে মধ্যে ভীষণ ঘোর গর্জ্জন। এ কোমল কণ্ঠের কোমল মৃদুমধুর শব্দ নহে। সমুদ্রগর্জ্জন বা ঘনঘটার ঘোর গর্জ্জনের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। আকাশে সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠিতেছে, আবার সেই প্রতিধ্বনি পার্ব্বত্য প্রদেশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গর্জ্জন করিতেছে। কি ভীষণ ভাব! ভগিনি! কল্পনা-চক্ষু উন্মুক্ত কর। দেখ দেখ, অস্থির হইও না। ভয়ে মূর্চ্ছিত হইও না। আজি মহাতীর্থযাত্রীদিগের মহাযাত্রা দেখিয়া ধন্য হও, জন্ম সফল কর। যাত্রীদিগের পদধূলি কি চাও? তোমার কোমল অঙ্গে মর্দ্দন কর! মস্তকে গ্রহণ কর। তুমিও দেবী-প্রসাদলাভে দেবীরূপে পূজিত হইবে।

এ দিকে সম্মুখে মহাশত্রুর দল। তাহাদের ভীষণ গর্জ্জন, মধ্যে মধ্যে আগ্নেয় অস্ত্রের ভয়াল গর্জ্জনের সহ মিশিয়া নগরকে—পল্লিকে আতঙ্কিত করিতেছে। এই ভীষণ ভাবের মধ্যে তেজস্বিনী বীরনারীদলের সংমিশ্রণ হইল। তুর্কিরা অলোকসামান্যা লাবণ্যময়ী নারী-রত্নমণ্ডলী দর্শনে দ্বিগুণ উৎসাহান্বিত হইয়া মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় সম্মুখে যাহা পাইল পদদলিত করিতে করিতে অগ্রসর হইল। সর্দ্দারপত্নী রমণীদলের অগ্রণী হইলেন। তাঁহার ভৈরব গর্জ্জনে অনুপ্রাণিত হইয়া রমণীদল রণাঙ্গনে মরণভয় তুচ্ছ করিয়া করাল কালকবলে মিশিতে রণ আরম্ভ করিল। বিষম যুদ্ধ বাধিল। এ অসম যুদ্ধ কতক্ষণ চলিতে পারে? এ যুদ্ধ অসম

হইলেও বিষম বোধ হইল। ধর্ম্ম ও সতীত্ব যেন মহাশক্তিরূপে রমণীদলকে মহাশক্তি প্রদান করিল। মধ্যে মধ্যে সর্দ্দারপত্নী ভীমভৈরব গর্জ্জন করিয়া বলিতেছেন, "ভগিনীগণ! যদি ধর্ম্ম, জাতি ও সতীত্ব রক্ষা করিতে চাও, তবে আইস, স্বর্গের দেবতারা আমাদিগকে শক্তি দিবেন। সেই মহাশক্তিতে বলবতী হইয়া আইস শত্রুবিনাশ করি, ভয় নাই। আমাদের পিতা নাই, পতি নাই, ভ্রাতা নাই, পুত্র নাই, বন্ধু নাই, কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? ঈশ্বর আমাদের সহায়, তিনি আমাদের বল-বিধাতা। যদি যুদ্ধে প্রাণ যায়, ভাল। নচেৎ ঐ নরপিশাচদিগের হস্তে আমাদের স্বর্গাদপি গরীয়ান্ ধর্ম্ম, আমাদের প্রিয় সতীত্ব রক্ষা পাইবে না। তোমরা কি ঐ নরদৈত্যদিগের অঙ্কশায়িনী হইতে চাও? তোমরা কি যবন-ধর্ম্মকে গ্রহণ করিতে চাও? যদি চাও, পশ্চাতে সরিয়া যাও। আর সময় নাই।" এই উক্তিতে রমণীদল প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। সম্মুখে পশ্চাতে দলে দলে রমণীগণ রণাঙ্গনে শয়ন করিতেছে, ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্রের ভীষণাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া পতিত হইতেছে; কাহারও দৃক্পাত নাই, ভয় নাই, পশ্চাৎ অপসরণ নাই। পলায়ন কাহাকে বলে কেহ জানে না। দিবা অবসান হইল। অন্ধকার জগৎকে আচ্ছন্ন করিল। সমভাবে যুদ্ধ চলিল। নিশাবসানে রমণীদল আর স্থিরপদে দাঁড়াইতে পারিল না। হস্ত আর অস্ত্র ধরিয়া রাখিতে পারিল না। প্রাতঃ-সূর্য্যের নবোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সকলে চারি দিকে চাহিয়া দেখিল যে, শত্রুমণ্ডলী ব্যূহবদ্ধ করতঃ বেষ্টন করিয়া আসিতেছে, নরমাংসলোলুপ শার্দ্দূলের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে লম্ফ দিয়া আসিতেছে। প্রবল প্লাবন যেমন দেশ নগরকে ভাসাইয়া ক্রমে অগ্রসর হয়, শত্রুদল ক্রমেই সেইরূপ অগ্রসর হইতেছে। আর রক্ষা নাই; ধর্ম্ম, জাতি, সতীত্ব আর রক্ষা পাইল না। উপায় কি? সর্দ্দারপত্নী চারি দিকে চাহিয়া দেখিল প্রায় চারি দিকেই শত্রুমণ্ডলী। অনতিদূরে একটা ক্ষুদ্র পর্ব্বত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সেই দিকে ছুটিল। বাধা মানিল না; কে সে মহাশক্তিরূপিণী রমণীদিগকে বদ্ধ করে? পর্ব্বতের দিকে ছুটিল। শত্রু তখন দূরে।

এদিকে চাহিয়া দেখ। মৃতাবশিষ্ট রমণীদল দ্রুতপদক্ষেপে শৈলশিখরে উঠিতে লাগিল। সর্দ্দারপত্নী সদ্যোজাত সন্তানকে দৃঢ়রূপে পৃষ্ঠদেশে পুনরায় আবদ্ধ করিয়া লইল। চারি দিকে চাহিয়া বলিল "প্রাণের ভগিনীগণ! ঐ দেখ, সম্মুখে শত্রুদল। আমরা যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়াছি। ঐ দেখ আমাদের ভগিনীগণ রণক্ষেত্রে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তোমরা কি চাও; তোমরা কি ঐ নরপিশাচদিগের বিলাসবাসনা পূর্ণ করিবে, না, স্বর্গের মাধুর্য্য ভোগ করিবে? তোমরা কি শত্রুর ধনরত্নের জ্যোতিতে আপন

কমনীয় বরণীয় অঙ্গ সুসজ্জিত করিয়া আপন অঙ্গকে আরো উজ্জ্বল করিবে, না, মহান্ পরম দেবতার প্রেম রত্নের জলন্ত আভায় আভাষিত হইবে? তোমাদের দুইটী পথ আছে, কোন্ পথ গ্রহণ করিবে? ঐ মহাশত্রুর অঙ্কশায়িনী হইয়া মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ কর, নচেৎ এই পথ গ্রহণ কর।” এই বলিয়া বীররমণী শৈলশিখর হইতে নিম্নে পতিত হইলেন। নিম্নে শৈলখণ্ড স্তরে স্তরে সজ্জিত, সেই পতনে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চূর্ণ হইয়া গেল। শিশুও চূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার ধর্ম্ম, জাতি, সতীত্ব রক্ষিত হইল। এই আত্ম-উৎসর্গের ফল ফলিল। এই আত্ম-উৎসর্গের মধ্যে কি যে এক মহাশক্তি লুক্কায়িত ছিল, বলিতে পারি না। সেই মহাশক্তি মহীয়সী হইয়া আপন অদ্ভুত কার্য্য জগতকে দেখাইল। জগৎও স্তম্ভিত হইল।

আবার চাহিয়া দেখ। এক, দুই, তিন, চারি করিয়া মৃতাবিশিষ্ট রমণী-দল সেই শৈলশিখরে উঠিয়া আত্ম-উৎসর্গের মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতে লাগিল। ধর্ম্ম জাতি সতীত্ব রক্ষার জন্য প্রাণের মমতা না করিয়া, জগতের বরণীয় লাবণ্যচ্ছটার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, একে একে শৈলশিখর হইতে পতিত হইতে লাগিল। সকলেই চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পড়িল। লাবণ্যময়ী, জগজ্জ্যোতিরূপিণী আর্য্যাণী রমণী আজ অস্ত্রহস্তে পড়িয়া জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে আপন মহিমা, আপন অলৌকিক গৌরবের জলন্ত প্রভা সন্নিবিষ্ট করিয়া মরজগৎ হইতে অমর জগতে গমন করিল। এ আত্মদান জগতে অনন্ত কাল গীত হইবে। যাঁহার চক্ষু আছে, তিনি দেখিবেন, এই শোক দুঃখ-বিষাদময় জগতে এই স্থান দেবলীলাভূমি, চির-আনন্দময় ধাম। এই রমণীগণ মানবী নহে, দেবী। ইহাদের আত্মদানে জগৎ ধন্য হইয়াছে।

দশবিধি।

সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মোপদেষ্টা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি মূল বিধি ও নিষেধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সূক্ষ্মভাবে দর্শন করিলে এ সকলের মধ্যে অনেকটা সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে এই সপ্রমাণ হয় যে, ধর্ম্ম একই বস্তু এবং মানব-প্রকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহা অনেকটা একই ভাবে বিকসিত হইয়াছে। এই জন্য প্রকৃত ধার্ম্মিকদিগের কথা এক, চরিত্রও প্রায় একই প্রকার। সত্যধর্ম্ম চিরকালই সত্য এবং তাহা দ্বারা জীবন পবিত্র হইয়া মুক্তি ও পরিত্রাণ লাভ করে।

আমাদের দেশের প্রাচীন মনু ধর্ম্মের দশ লক্ষণ বলিয়াছেন। তাহা এই—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং।

ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনঃসংযম, অচৌর্য্য, শুচিতা, ইন্দ্রিয়দমন, বিবেক, ব্রহ্মবিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ ধর্ম্মের এই দশটী লক্ষণ।

(১) ধৈর্য্য—অর্থাৎ সর্ব্বদা শান্তভাবে থাকিয়া সুখ দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করা।

(২) ক্ষমা—লোকে নিন্দা, তাড়না, বা অত্যাচার করিলে সহ্য করিয়া তাহাদের প্রতি সদ্ভাব প্রকাশ করা।

(৩) দম—প্রবৃত্তি সকলকে সুশাসিত রাখা।

(৪) অস্তেয়—অচৌর্য্য অর্থাৎ যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহা হরণ বা কাহার প্রতি অন্যায়াচরণ না করা।

(৫) শৌচ—শরীর, বাক্য ও মনকে সর্ব্বপ্রযত্নে পবিত্র রাখা।

(৬) ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ—অর্থাৎ শারীরিক ইন্দ্রিয় সকলকে অবৈধ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া শাসনে রাখা।

(৭) ধী—ধর্ম্মবুদ্ধি বা বিবেক, যাহাতে সৎ অসতের বিচার করিয়া অসৎ পরিহার-পূর্ব্বক সৎ গ্রহণ করা যায়।

(৮) বিদ্যা—তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান।

(৯) সত্য অর্থাৎ সত্য কথন, সত্য চিন্তন ও সত্য অনুষ্ঠান।

(১০) অক্রোধ অর্থাৎ সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া থাকা—শত্রুমিত্রে সমজ্ঞান ও প্রতিকূল অবস্থায় রাগ বা বিরাগ প্রকাশ না করা।

খৃষ্টধর্ম্ম-গুরু ঈশা তাঁহার শিষ্যদিগকে ধর্ম্মের যে দশটী উপদেশ দিয়াছেন তাহা এইঃ—

(১) দীনাত্মারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই জন্য।

(২) শোকার্ত্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে।

(৩) সুশীলেরা ধন্য, কারণ তাহারা পৃথিবীর অধিকারী হইবে।

(৪) ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিরা ধন্য, কারণ তাহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে।

(৫) দয়ালুরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দয়া লাভ করিবে।

(৬) নির্ম্মলচিত্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে।

(৭) শান্তি-সংস্থাপকেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সন্তান নামে অভিহিত হইবে।

(৮) ধর্ম্মের জন্য নিপীড়িতেরা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই জন্য।

(৯) তোমার প্রভু পরমেশ্বরকে সমুদায় হৃদয়, সমুদায় মন ও সমুদায় শক্তির সহিত ভালবাস।

(১০) তোমার প্রতিবাসীকে আত্মবৎ প্রীতি কর।

প্রাচীন ইহুদীদিগের মতে স্বয়ং ঈশ্বর তাহাদিগের ধর্ম্মাচার্য্য মুসার নিকট প্রকাশিত হইয়া এই দশ আজ্ঞা প্রচার করেন :—

(১) আমি তোমার প্রভু পরমেশ্বর; আমার সম্মুখে অন্য কোন দেবতার পূজা করিও না।

(২) ঈশ্বরের কোনও প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিও না।

(৩) তোমার প্রভু পরমেশ্বরের নাম বৃথা লইও না।

(৪) বিশ্রাম-বারকে পবিত্র দিন বলিয়া মান্য করিবে।

(৫) তোমার পিতামাতাকে সম্মান কর যে, ঈশ্বরের প্রসাদে দীর্ঘ জীবন লাভ করিবে।

(৬) প্রাণিবধ করিও না।

(৭) ব্যভিচার করিও না।

(৮) চুরি করিও না।

(৯) প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।

(১০) প্রতিবাসীর ধনসম্পত্তির প্রতি লোভ করিও না।

বুদ্ধের শিষ্যগণের প্রতি বুদ্ধদেবের দশ আজ্ঞা এইঃ—

(১) হত্যা করিও না, কিন্তু জীবের প্রতি স্নেহ কর।

(২) চুরি করিও না, দস্যুবৃত্তি করিও না; কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার পরিশ্রমের ফল যাহাতে ভোগ করিতে পারে, তাহার সহায়তা কর।

(৩) অপবিত্রতা হইতে দূরে থাক এবং পবিত্র জীবন ধারণ কর।

(৪) মিথ্যা কহিও না, সত্যপরায়ণ হও। সদ্বিবেচনার সহিত সত্য কথা বল, যাহা বলিবে, নির্ভয়ে ও সপ্রেম অন্তরে বলিবে।

(৫) কুৎসাবাদ সৃষ্টি করিও না, তাহা রটনাও করিও না। পরচ্ছিদ্র অনুসন্ধান করিও না, কিন্তু অন্যের ভাল দিক্ দেখিবে, তাহা হইলে তাহাদিগের শত্রুগণের সম্মুখে তাহাদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে পারিবে।

(৬) শপথ করিও না, কিন্তু ভদ্রতা ও আত্মমর্য্যাদার সহিত কথা কও।

(৭) গাল গল্প করিয়া সময় কাটাইও না, কিন্তু হয় প্রয়োজন মত কথা কও, নয় মৌনী হইয়া থাক।

(৮) লোভ করিও না, হিংসা করিও না, কিন্তু অন্য লোকের সৌভাগ্যে আনন্দ কর।

(৯) হৃদয়কে ঈর্ষ্যার মলা হইতে পরিষ্কার কর এবং মনে ঘৃণা পোষণ করিও না—শত্রুদিগের প্রতিও ঘৃণা করিও না, সকল জীবকে প্রীতির সহিত আলিঙ্গন কর।

(১০) মনকে অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত কর, এবং সত্য শিক্ষা করিতে ব্যগ্র হও—নতুবা নাস্তিকতা ও ভ্রান্তিতে পতিত হইবে; নাস্তিকতা ঔদাসীন্য আনয়ন করিবে এবং ভ্রান্তি অনন্তজীবনের পথ হইতে তোমাকে ভ্রষ্ট করিবে।

বুদ্ধের মতে শারীরিক পাপ ৩টী—হত্যা, চুরি, ও ব্যভিচার; বাচনিক ৪টী—মিথ্যা, কুৎসা, কটু ভাষণ, ও গল্প; মানসিক ৩টী—হিংসা, ঘৃণা, ও ভ্রান্তি। এই

দশ নিষেধ পরিত্যাগ করিয়া দশবিধি পালন করিবে।

মুসলমানদিগকে হিন্দুরা ম্লেচ্ছ ও বিধর্ম্মী বলিয়া ঘৃণা করেন, কিন্তু তাঁহাদিগেরও মূল ধর্ম্মোপদেশ সকল অতি পবিত্র ও সমাদরণীয়।

মুসলমান-শাস্ত্র-সঙ্কলিত দশবিধি।

১। ঈশ্বর এক, তাঁহা ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই এবং তাঁহার অংশী বা সরিক নাই।

২। অবিশ্রান্ত ঈশ্বরের উপাসনা কর, অবিশ্রান্ত তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর।

৩। দান ধর্ম্মের প্রধানতম অঙ্গ। অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মানব ঈশ্বরের গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে, দানের সহায়তা ভিন্ন গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না।

৪। ঈশ্বর যেরূপ ন্যায়বান্, সেইরূপ দয়ালু। অবিশ্বাসী ভিন্ন তাঁহার দয়াতে কেহ নিরাশ হয় না।

৫। রিপুর বশীভূত হইও না, কেননা রিপু সকল ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট করে। যাহারা ঈশ্বরের পথভ্রষ্ট হইয়া অন্য পথে গমন করে, তাহারা অতি কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে।

৬। পিতামাতার সেবা কর, বয়োবৃদ্ধকে মান্য কর এবং কনিষ্ঠকে দয়া কর।

৭। অতিথি-সেবা একটী পরম ধর্ম্ম ও নিত্য কর্ম্ম।

৮। পিতৃমাতৃহীন ও দরিদ্রদিগের প্রতি দয়া করিবে।

৯। সাক্ষ্য গোপন করিও না। যে সাক্ষ্য গোপন করে, সে ঘোর পাপে পতিত হয়। তোমরা যাহা কর, ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা।

১০। প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচরণ, অত্যাচার ও চুরি করিও না। স্বীয় ধন শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিষয়ে ব্যয় করিও না—সুরাপান, জুয়াখেলা প্রভৃতি শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

কুরু-মাতা।

যাহারা প্রতারণাপূর্ব্বক পঞ্চ পাণ্ডবদিগকে বনবাসগমনে বাধ্য করিয়াছিল, জতুগৃহ দাহ করিয়া যাহারা পাণ্ডবকুল নির্ম্মূল করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল, কৃত্রিম দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয় করিয়া যাহারা পাণ্ডবকুলবধূ দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক রাজসভায় আনয়ন করিয়া অপমান ও নির্যাতনের একশেষ করিয়াছিল, পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিবার জন্য যাহারা ছল, বল, কৌশল ইত্যাদি সর্ব্ববিধ পাপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদের মাতাকেই "কুরু-মাতা" নামে উল্লেখ করা হইল। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি পাপমতি এক শত সন্তানের মাতা তিনি। মহাভারত-কার কুরুকুলের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন,

তাহাতে গান্ধারীকে চোর ও দস্যু-মাতা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে; কিন্তু গান্ধারীর চরিত্র সন্তানগণের অনুরূপ নহে, গান্ধারীর জীবন অতি মহত্ত্বাবপূর্ণ।

গান্ধারী পতিপরায়ণতা গুণে মহিলা-জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছেন। স্বামী অন্ধ; কিন্তু তিনি অন্ধ স্বামীর চক্ষুস্বরূপ হইয়া তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। স্বামীর সেবা ও স্বামীর চিত্তরঞ্জন তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। অপর দিকে সত্যানুরাগ এবং উদারতায় তাঁহার হৃদয় বিভূষিত ছিল।

পরীক্ষায় পতিত হইলেই হৃদয়ের প্রকৃত ভাব প্রকাশিত হয়। যখন কোনও প্রকার বিপদ বা পাপ প্রলোভন সম্মুখে থাকে না, সংসার বিবিধ কাম্য বস্তুতে পূর্ণ থাকে, গৃহ আনন্দভবনে পরিণত হয়, সেই অবস্থাতে অনেকেই স্বভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন। কিন্তু যখন একে একে প্রাণপ্রিয় জনগণ এই জগৎ হইতে অদৃশ্য হয়, অথবা সংসারের বিষয় সম্পদ্ বিনষ্ট হয়, রাজভবন পর্ণকুটীরে পরিণত হয়, আশার তরু সমুদয় ভগ্ন হইয়া যায়, তখন যিনি শান্তভাবে ঈশ্বরের মুখ চাহিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন, তিনিই ধন্য। গান্ধারীর জীবন শেষোক্ত শ্রেণীর।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে দুর্য্যোধন প্রভৃতি এক শত ভ্রাতা পাণ্ডবের করাল হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। কুরুকুলের অন্যান্য বীর-গণ অনন্ত কালশয্যায় শায়িত। কুরুগৃহ বিধবাগণের হাহাকারধ্বনিতে পূর্ণ। এই কুরু-শ্মশানে দণ্ডায়মান হইয়া শোক-দগ্ধা গান্ধারী ব্যাসদেবের সহিত যে কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহার আংশিক অনুবাদ উদ্ধৃত করা হইল। এখানে বলা আবশ্যক যে, ভীম দুর্য্যো-ধনকে অন্যায় যুদ্ধে নিহত করেন। সে সময়ের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় নিয়মানুসারে কোনও যোদ্ধাই নাভির নিম্নভাগে গদাঘাত করিতেন না। নাভির নিম্নদেশে গদাঘাত করা পাপ বলিয়া বিশ্বাস ছিল। ভীম পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা অনুসারে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করেন।

গান্ধারী ভীমের অন্যায় আচরণ দেখিয়া ক্রোধযুক্ত হন। এই অন্যায় যুদ্ধ নিবন্ধন পাণ্ডবদিগকে অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হন। তখন ব্যাসদেব আসিয়া বলেন, "বৎসে! যে স্থানে ধর্ম্ম, সে স্থানে জয়। হে কল্যাণি! তুমি সমস্ত জীবগণের হিত-সাধনে সর্ব্বদা যত্ন করিয়া থাক। তোমার বাক্য কোন ক্রমেই অন্যথা হয় না। মহামতি পাণ্ডবগণ ঘোরতর সংগ্রামে অসংখ্য ভূপতির জীবন সংহার করিয়া জয় লাভপূর্ব্বক তোমার বাক্যের যাথার্থ্য সম্পাদন করিয়াছে। পূর্ব্বে তোমার অসাধারণ ক্ষমা গুণ ছিল, অদ্য তুমি কি কারণে সেই গুণ পরিত্যাগ করিতেছ? যে স্থানে ধর্ম্ম, সে স্থানেই জয় হইয়া থাকে। অতএব তুমি স্বীয় ধর্ম্ম ও পূর্ব্বোক্ত বাক্য সমুদয় স্মরণপূর্ব্বক এক্ষণে ক্রোধ সংবরণ কর।"

গান্ধারী কহিলেন, "হে ভগবন্! পাণ্ডবগণের প্রতি আমার ঈর্ষ্যা নাই। আর তাহারা যে নিহত হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু আমি পুত্রশোকে ব্যাকুল হইয়াছি। কুন্তী যেরূপ পাণ্ডবগণকে প্রতিপালন করেন, আমি এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র, আমরাও সেইরূপ তাহাদিগকে রক্ষা করিব। দুরাত্মা দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের অপরাধেই কুরুবংশ ধ্বংস হইয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির, বৃকোদর, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের কিছুমাত্র অপরাধ নাই। কৌরবগণ গর্ব্ববশতঃই সমরে প্রবৃত্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মহামতি বৃকোদর যে দুর্য্যোধনকে গদাযুদ্ধে আহ্বান করিয়া তাহাকে অপেক্ষাকৃত শিক্ষানিপুণ অবলোকনপূর্ব্বক কেশবের সমক্ষেই তাহার নাভির অধোদেশে গদাঘাত করিয়াছে, তাহার সেই অধর্ম্মই আমার ক্রোধানল প্রজ্বলিত করিয়াছে। আপনার জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত রণস্থলে সাধুগণ-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কি বীরপুরুষের উচিত কার্য্য?"

সত্যপ্রিয়া গান্ধারীর হৃদয়ের ভাব অতি স্পষ্টরূপে এ স্থলে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কৌরবগণ পাপপথ অবলম্বন করিয়াছিল, পঞ্চ পাণ্ডব যে তাহাদিগকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মানুমোদিতই হইয়াছে। যদিও তাঁহার পুত্রগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি পাণ্ডবদিগের প্রতি তাঁহার প্রেমের হ্রাস হয় নাই। তিনি বলিতেছেন, "কুন্তীর ন্যায় আমরা পাণ্ডবদিগকে প্রতিপালন করিব।" কি উদার প্রেম! কুলহন্তা শত্রুর প্রতি এরূপ প্রেমের দৃষ্টান্ত অতি দুর্লভ। পাণ্ডবগণ ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন, এজন্য তাহাদের প্রতি গান্ধারীর আন্তরিক প্রেম। যাঁহারা ধর্ম্মকে জীবনের সার করিয়াছেন, ঈশ্বরের প্রীতি যাঁহাদের হৃদয়ের ভূষণ, তাঁহারা এইরূপেই শত্রুদের গুণগান করিয়া থাকেন এবং তাহাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। কিন্তু গান্ধারীর বিরক্তি ও ক্রোধ কাহার উপর? ভীম অন্যায় যুদ্ধে দুর্য্যোধনকে হত করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার মর্ম্মান্তিক যাতনা। ন্যায় যুদ্ধে বিনাশ করিলে এরূপ মনঃকষ্ট হইত না। বাস্তবিক সত্যগতপ্রাণ মানবমাত্রেই অন্যায়ের প্রতি, পাপের প্রতি এরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন। উহা ক্রোধ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না, পাপ হইতে দূরে থাকিবার জন্য, অন্যায় নিবারণ করিবার জন্য পরমেশ্বর মানবহৃদয়ে যে বল প্রদান করিয়াছেন, তাহাই তেজের আকারে প্রকাশিত হইয়া অন্যায়কারীকে শাসন করে। এই তেজ সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। গান্ধারীর হৃদয়ে একদিকে যেমন সত্যানুরাগ, উদার প্রেম এবং ন্যায়ান্যায়ের প্রতি সূক্ষ্মদৃষ্টি, অপর দিকে অন্যায়কারীর প্রতি সেইরূপ তীব্র ঘৃণা। বাস্তবিক তাঁহার হৃদয়ে সকল সাধু ভাবই প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। গান্ধারীর পতিভক্তি, সত্যানুরাগ ও উদার প্রেম মহিলাগণের অনুকরণীয়।

ইতর প্রাণীর আয়ুষ্কাল।

নরা গজা বিশে শয়।
তার অর্দ্ধেক হয় হয়॥
বাইশ বলদা তেইশ ছাগলা।
তার অর্দ্ধেক বরা পাগলা॥

প্রাগুক্ত প্রবাদটি বহুকাল হইতে আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, মনুষ্য এবং হস্তীর আয়ুষ্কাল ১২০ বৎসর, ঘোটকের ৬০ বৎসর, বলদের ২২, ছাগলের ২৩, এবং শূকরের ১১॥ সাড়ে এগার বৎসর মাত্র। বর্ত্তমান কালে প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে এতদ্বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে। তাঁহারা বলেন, ইতর প্রাণীর মধ্যে এক এক জাতীয় সকল জন্তু সমপরিমাণ জীবন লাভ করে, কেবল মনুষ্যের মধ্যে এই নিয়মের ব্যভিচার পরিদৃষ্ট হয় অর্থাৎ কোন মনুষ্য ৩০, কেহ ৫০, কেহ ৮০, কেহ বা ১০০ বা ততোধিক বৎসর কাল জীবিত থাকে। ইতর প্রাণী সকল স্বাধীন বন্যাবস্থায় কি পরিমাণ আয়ুঃ লাভ করে, তাহা স্থির করা যায় না। তবে যাহাদিগকে পোষা যায়, বদ্ধাবস্থায় রাখা যায়, তাহাদিগের আয়ুষ্কাল এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। বন্যাবস্থায় উহাদিগের আয়ুষ্কালের সাম্য আছে কি না, তাহা অদ্যাপি কোন প্রাণিতত্ত্ববিৎ স্থির করিতে সমর্থ হন নাই। ইহাদের মধ্যে শশক ও শূকরশাবক ৭ বৎসর, কাঠবিড়ালী ৮, বিড়াল ৯ হইতে ১০, কুকুর ১০ হইতে ১২, খেঁকশিয়ালী ১৪ হইতে ১৬, গরু ১৫ হইতে ১৮, ভল্লুক ও নেকড়েবাঘ ২০, গণ্ডার ২৫, গর্দ্দভ ও ঘোটক ২৫ হইতে ৩০, সিংহ ৩০ হইতে ৪০, এবং উষ্ট্র ৪০ বৎসর কাল পরমায়ু লাভ করে। কিন্তু লণ্ডনের পশুশালায় একটি সিংহ ৭০ বৎসর কাল জীবিত ছিল, এরূপ শুনা যায়। হস্তী কতকাল জীবিত থাকে, তাহা নিঃসংশয়িতরূপে বলা যায় না। এতদ্দেশে প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে ধরিতে গেলে, হস্তীর আয়ুষ্কাল ১২০ বৎসর বলিতে হয়। কিন্তু পণ্ডিত আরিষ্টটল, বফন ও কুভিয়রের (Aristotle, Buffon and Cuvier) মতে হস্তীর আয়ুষ্কাল ২০০ দুই শত বৎসর। আবার কাহারও কাহারও মতে ৪।৫ শতাব্দী। পুরুদিগের সহিত সংগ্রামে জয় লাভ করিয়া মহাবীর আলেকজন্দর যে হস্তীকে সূর্য্যদেবের নামে উৎসর্গ করিয়া অযক্ষ নাম প্রদান করিয়াছিলেন, সেই হস্তীটিকে নাকি এই ঘটনার ৩৫০ বৎসর কাল পরেও জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছিল। অতি প্রাচীন কালে একটি হরিণের নিরতিশয় দীর্ঘ জীবনের কথা শুনা গিয়াছে, কিন্তু আরিষ্টটল তাহাকে ভিত্তিশূন্য প্রবাদ বলিয়া অবিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন। বফন বলেন, ৫।৬ বৎসর কাল হরিণের দৈহিক পূর্ণ বিকাশের সময়, এবং ইহার আয়ুষ্কাল ইহার সপ্তগুণ মাত্র

অর্থাৎ হরিণের জীবনকাল ৩০হইতে ৪২ বৎসর। জলচর প্রাণীর আয়ুষ্কাল স্থির করা কিছু কঠিন। কিন্তু তাহা হইলেও যতদূর জানা গিয়াছে, মৎস্যজাতীয় জন্তু, বিশেষতঃ বৃহদায়তন মৎস্য সকল নিরতিশয় দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া থাকে।

বেকনের মতে ইল্ বা বাইন মৎস্য ৬০ বৎসর কাল আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়। কার্প নামক মৎস্য ১৫০ দেড়শত বৎসর জীবিত থাকে। বৃদ্ধাবস্থায় মনুষ্যের শক্তি সামর্থ্য থাকে না, জরাগ্রস্ত হইলে উৎসাহ স্ফূর্ত্তিও ক্ষীণ হইয়া যায়। কিন্তু তাদৃশ দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত প্রাগুক্ত কার্প মৎস্যের স্ফূর্ত্তি ও ক্রীড়াশীলতা দেখিয়া বফন্ বিস্মিত হইয়াছিলেন। হাঙ্গর এক শতাব্দীর অধিক কাল জীবিত থাকে এবং তাহার অতি বৃহৎ শরীর ধারণ করিবার কথা শুনা যায়। পাইক মৎস্য ওজনে এক সহস্র পাউণ্ড বা ১২॥০ সাড়ে বার মণ পর্য্যন্ত হইবার কথা শুনা গিয়াছে। ইহা দ্বারা অনুমিত হয়, এই মৎস্য অতি দীর্ঘজীবী। ১৪৯৭খৃঃ অব্দে কায়সরস লতারণ নামক কোন জলাশয়ে ১৯ ফিট্ দীর্ঘ একটী পাইক মৎস্য ধৃত হয়, উহা ওজনে ৩৫০ পাঁউণ্ড হইয়াছিল। উহার কান্কোতে একটী তাম্র অঙ্গুরীয়ক সংলগ্ন ছিল। ঐ মৎস্য যে সম্রাট্ দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের আদেশানুসারে উক্ত সরোবরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা উহাতে লিখিত ছিল। অর্থাৎ যে সময় মৎস্যটি উক্ত সরোবর হইতে ধৃত হয়, তাহার ২৬১ বৎসর পূর্ব্বে উহা ঐ লতারণ জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। মেরুসন্নিহিত সাগরে অনেক সময় অনেক বৃহদায়তন তিমিমৎস্য শিকারের কথা শুনা যায়। এই তিমি মৎস্য বহু শতাব্দী কাল জীবিত থাকে। কেহ কেহ বলেন, ইহার আয়ুষ্কাল এক সহস্র বৎসরেরও অধিক। মৎস্যের দীর্ঘ জীবন লাভের যতগুলি কারণ এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহার দৈহিক বিকাশের সাময়িক দীর্ঘতা, তাপের ন্যূনতা, জীবনী শক্তির ক্ষীণতা অন্য কারণ। আবার এক প্রকার ইতর প্রাণী আছে, উহাদের ইন্দ্রিয় সকল নিরতিশয় সতেজ, জীবনী শক্তি যার-পর-নাই সবল এবং আয়ুষ্কাল অতিশয় দীর্ঘ। ইহারা পক্ষিজাতি। ইহাদের আয়ুষ্কাল সম্যক্ পরিজ্ঞাত না হইলেও, ইহারা যে নিরতিশয় দীর্ঘজীবী, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বহুসংখ্যক তালচঞ্চু পক্ষীর বহুদেশ ভ্রমণপূর্ব্বক বহু বৎসর পরে আবার স্বীয় বাসাতে প্রত্যাগত হইবার কথা অনেকে শুনিয়াছেন। একদা ভীয়েনা নগরে একটি ঈগল পক্ষী ১০৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জীবলীলা সংবরণ করে। বফনের মতে কাকের আয়ুষ্কাল ১০৮ বৎসর, আবার হিসিয়াডের (Hisiod) মতে এক সহস্র বৎসর। কিন্তু হিসিয়াডের মতের পরিপোষক কোন প্রমাণ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত উইলোবীর (Willoughby) মতে রাজহংসের জীবনকাল এক শত

বৎসর। পণ্ডিত বফন (Buffon) শত-বর্ষেরও অধিক ইহার আয়ুষ্কাল স্থির করিয়াছেন। অপর কোন কোন গ্রন্থে রাজহংসের তিন শতাব্দী কাল জীবন ধারণের কথা পাঠ করা যায়। মিলারটন (Milerton) একটি সোয়ান পক্ষীর কঙ্কাল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উহা নাকি ৩০৭ বৎসর জীবিত ছিল। প্রাগুক্ত বিষয়ের আলোচনা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বৃহদায়তন জন্তুগণের মধ্যে, বিশেষতঃ পক্ষিজাতির মধ্যে দৈহিক আয়তনের দীর্ঘতা অনুসারে আয়ুকালের দীর্ঘতা পরিমিত হইয়া থাকে। কীটরাজ্যে প্রবেশ করিলে দেখা যায় উহাদের দৈহিক আয়তন ক্ষুদ্র বলিয়া জীবনও নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। কোন কীটের আয়ুকাল ৭ হইতে ১২ ঘণ্টা মাত্র। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে উহাদের জীবনের তাবৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। আমরা প্রতিনিয়ত দেখিতেছি, কত কীট জন্মিতেছে কিছুক্ষণ ক্রীড়া কুর্দনে কাটাইতেছে, আবার পরক্ষণে তাহাদের ক্ষুদ্র দেহ প্রাণশূন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এই সকল দেখিলে ও অনুধ্যান করিলে, মানব জীবনকে এক গভীর প্রহেলিকা বলিয়া মনে হয়। আমরা জ্ঞান বিজ্ঞানের গর্ব্ব করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা কি জানি, আমরা কে, কি জন্য আসিয়াছি, কি করিতেছি, কত কাল বাঁচিব, পরে কোথায় যাইব? কেবল যাঁহারা ঈশ্বরবিশ্বাসী, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, আমরা অমর আত্মা, ঈশ্বরের কার্য্য করিতে তাঁহার সংসাররূপ কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়াছি, তাঁহার কার্য্য করিতেছি; এখন তাঁহার আশ্রয়ে আছি, পরেও তাঁহার আশ্রয়ে থাকিব।

ড্রামণ্ড্ ক্যাসেল নামক জাহাজ-ডুবী উপলক্ষে।

(১৮৯০ সনের ১৬ই জুন মঙ্গলবার)

হায় হায় কি হইল—এ কি সর্ব্বনাশ!
মুহূর্ত্তে অর্ণবযান, অতলেতে অন্তর্ধান।
শত শত প্রাণ আজ পাইল বিনাশ!
কুমার কুমারী কত, চির জনমের মত,
অপার বারিধি-নীরে হইল মগন;
কত সতী পতি-হারা, নয়নে বহিছে ধারা,
অনাথিনী শূন্যময় হেরিছে ভুবন!
হয়ে পিতৃমাতৃহীন, কত শিশু দীন হীন,
কাঙ্গালের বেশে আজ করিছে ভ্রমণ;
কে চাহিবে মুখপানে, কেবা পরাণের টানে
সস্নেহে চিবুক ধরি করিবে চুম্বন?
যখন আরোহি-দল জানিল আশার স্থল

নাহি আর—হবে আজ নিশ্চয় মরণ,
মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ (কে বর্ণিবে সে বিষাদ?)
বিদারিছে যেন তায় মেদিনী গগন!
নীরবে বাষ্পীয় তরী—নিমগন, হরি হরি!
তব লীলা খেলা যত বুঝে উঠা ভার।
কে জানে কি অভিপ্রায়, ডুবাইলে নিরাশায়
স্নেহের বন্ধন ছিঁড়ি কত পরিবার!
কত আশা কত সুখ, আনন্দেতে ভরা বুক
আছিল যাদের, তারা কে জানিত হায়!
বিলয় পলক পরে চির জনমের তরে
পাইবে সাগরগর্ভে হ'য়ে নিরুপায়!
এ হ'তে অনিত্য ভবে, আর কি বল সম্ভবে,
এই আছে এই নাই—এমনি চঞ্চল,
নিয়তির নির্দ্ধারণ, কে করিবে নিবারণ,
অলঙ্ঘ্য তাহার বিধি—শাসন প্রবল!
অচিন্ত্য অভাবনীয় ঘটনা অঘটনীয়
ঘটিতেছে অহর্নিশ—চক্ষের উপর,
তবুও চেতনাহীন চিরকাল—চিরদিন
বারেক না ভাবে মনে সকলি নশ্বর।
কে জানে কি সূত্রে কারে নিয়ে যায় ভবপারে,
আমরা অবোধ নর বুঝিতে কি পারি?
কেন এ পরীক্ষা আসে, কেনবা সমূলে নাশে?
অজ্ঞান বুঝি না তাই চক্ষে বহে বারি!!

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস।

ব্রহ্মজ্ঞান।

(মহাভারত—মোক্ষধর্ম্ম হইতে)

"যদা চায়ং ন বিভেতি যদা চাস্মান্ন বিভ্যতি।
যদা নেচ্ছতি ন দ্বেষ্টি ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥
যদা ন কুরুতে ভাবং সর্ব্বভূতেষু পাপকং।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥
কামবন্ধনমেবৈকং নান্যদস্তীহ বন্ধনং।
কামবন্ধাদ্ যদা মুক্তো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥
সংযোজ্য মনসাত্মানমীর্ষ্যামুৎসৃজ্য মোহিনীং।
ত্যক্ত্বা কামঞ্চ মোহঞ্চ ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥
যদা শ্রাব্যে চ দৃশ্যে চ সর্ব্বভূতেষু চাপ্যয়ং।
সমো ভবতি নির্দ্বন্দ্বো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥
যদা স্তুতিং চ নিন্দাং চ সমত্বেনৈব পশ্যতি।
কাঞ্চনঞ্চায়সং চৈব সুখদুঃখে তথৈব চ।
শীতমুষ্ণং তথৈবার্থমনর্থং প্রিয়মপ্রিয়ং।
জীবিতং মরণং চৈব ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥
প্রসার্য্যেহ যথাঙ্গানি কূর্ম্মঃ সংহরতে পুনঃ।
তথেন্দ্রিয়াণি মনসা সংযন্তব্যানি ভিক্ষুণা॥
তমঃপরিগতং বেশ্ম যথা দীপেন দৃশ্যতে।
তথা বুদ্ধি প্রদীপেন শক্য আত্মা নিরীক্ষিতুং॥
জ্যোতিরাত্মনি নান্যত্র সর্ব্বজন্তুষু তৎসমং।
স্বয়ং চ শক্যতে দ্রষ্টুং সুসমাহিতচেতসা॥"

মানব যখন কাহা হইতে ভয় পায় না, এবং যখন তাহাকে কেহই ভয় করে না, যখন তাহার কিছুতেই দ্বেষ ও কামনা থাকে না, তখন তাহার ব্রহ্মলাভ হয়। যখন তাহার মন, বাক্য ও কার্য্য সর্ব্ব জীবের প্রতি পাপ-ভাব হইতে নির্ম্মুক্ত হয়, তখন তাহার ব্রহ্মলাভ হয়। এ সংসারে কামনা-বন্ধন ছাড়া আর কোনও বন্ধন নাই; মানুষ যখন সেই কামনা-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, তখন তাহার ব্রহ্মলাভ হয়। মোহকারিণী ঈর্ষ্যা এবং কাম ও মোহকে বিসর্জ্জন করিয়া মানব যখন মনকে পরমাত্মার সহিত সংলগ্ন করিতে পারে, তখন তাহার ব্রহ্মলাভ হয়। যখন

সর্ব্বপ্রকার দৃশ্য ও শ্রাব্য বিষয়ে এবং সর্ব্বভূতেই তাহার সমজ্ঞান হয়, যখন দ্বন্দ্ববুদ্ধি তিরোহিত হয় (১), তখন তাহার ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

যখন স্তুতি ও নিন্দা, লৌহ ও কাঞ্চন, সুখ ও দুঃখ, শীত ও উষ্ণ, অর্থ ও অনর্থ, প্রিয় ও অপ্রিয়, জীবন ও মরণ, এ সকলকে সে সমান জ্ঞান করে, তখন তাহার ব্রহ্মজ্ঞান হয়। কূর্ম্ম যেমন আপন অঙ্গ সকল সঙ্কুচিত করে, ব্রহ্মভিক্ষু তেমনি ইন্দ্রিয় সকলকে সঙ্কুচিত করিবেন। যেরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহ দীপালোকে প্রকাশিত হয়, পরমাত্মা সেইরূপ জ্ঞানালোকে প্রকাশিত হন। সেই পরম জ্যোতিঃ পরমাত্মা সর্ব্বজীবে সমভাবে বিদ্যমান থাকিলেও সুসমাহিতচিত্ত মানব স্বয়ং তাঁহাকে নিজ আত্মার মধ্যেই দেখিতে পান।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং পূর্ণং জ্যোতির্ম্ময়ং হরিং।
একমেবাদ্বিতীয়ং তমাত্মন্যেব বিলোকয়॥
আত্মন্যেব পরাত্মানং ভক্তিযোগেন পশ্যতঃ।
আত্মারামস্য নির্ব্বাণমাত্মন্যেব প্রতিষ্ঠিতং॥

অখণ্ডমণ্ডলাকার পূর্ণ সনাতন
জ্যোতির্ম্ময় অদ্বিতীয় যিনি নারায়ণ;
ত্রিভুবনে অন্য কোথা না পাইবে তাঁয়,
ভক্তিযোগে হের তাঁরে আপন আত্মায়।
ভক্তিযোগে তন্ময় হইয়া যেই জন,
আত্মমধ্যে পরমাত্মা করে দরশন;
আত্মানন্দে পরিপূর্ণ, নাহি বাহ্য জ্ঞান,
তাহার আত্মার মাঝে বিরাজে নির্ব্বাণ।
(কৃষ্ণভক্তি রসামৃতম্)

(১) মোক্ষধর্ম্মে 'সমজ্ঞান' বিষয়ে এইরূপ দৃষ্টান্ত আছে,

যশ্চ মে দক্ষিণং বাহুং চন্দনেন সমুক্ষয়েৎ।
সব্যং বাস্যাপি হস্তশ্চেৎ সমাবেতাবুভৌ মম॥

যে আমার দক্ষিণ হস্তে চন্দন মাখাইতেছে এবং যে আমার বাম হস্তে কুঠার হানিতেছে, তাহারা উভয়েই আমার নিকট সমান।

নূতন সংবাদ।

১। পারসী মহিলা কর্ণিলিয়া সোরাবজী বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া বরদায় ওকালতী করিতেছেন। তিনি সম্প্রতি পুনার এক খুনী বিচারে নৈপুণ্য-সহকারে ওকালতী করিয়া আসামিকে খালাষ দিয়াছেন। এখন হইতে পুনাতেই ব্যারিষ্টারি করিবেন।

২। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রজাসংখ্যা ৩৮ কোটি, কিন্তু চিন সম্রাটের ৪০ কোটি।

৩। সুপ্রসিদ্ধ ভূগোলপ্রণেতা বাবু তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় পরলোকগত হইয়াছেন।

৪। খলসুনীর বাবু যোগেন্দ্র নাথ বসু হুগলীজেলার একটি পাকা রাস্তার জন্য ১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

৫। গ্রেটবৃটনের বাণিজ্য-জাহাজ-সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার, তন্মধ্যে ৮হাজার বাষ্পীয় পোত।

৬। আগামী পূজার সময় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার কোমার পিথারাম

বৃত্তি লইয়া স্বদেশে গমন করিবেন। ইনি সুবিচার ও অনেক গুলি সদ্‌গুণের জন্য এদেশীয় সাধারণের বিশেষ প্রিয় হইয়াছেন। ইঁহার সম্মানার্থ স্থানে স্থানে সভা হইতেছে।

৭। ইটালীতে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য শশিকুমার হেস নামক আর এক জন বাঙ্গালী গিয়াছেন। রাজা সূর্য্য-কান্ত আচার্য্য চৌধুরী ইঁহার সমুদায় ব্যয়ভার বহন করিবেন।

৮। বোম্বাইয়ের কুমারী মাণিক বাই দাদাভাই নৌরজি এবং কুমারী মানিক আত্মারাম পাণ্ডুরঙ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের চিকিৎসাশাস্ত্র-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এল, আর, সি, পি, উপাধি পাইয়াছেন।

৯। রুশীয়া সাইবিরিয়া দিয়া যে রেল-পথ করিতেছেন, তাহা ৯ হাজার মাইলের অধিক দীর্ঘ হইবে। পৃথিবীতে এতাদৃশ বৃহৎ রেলওয়ে আর নাই। ইহা সম্পূর্ণ হইলে পূর্ব্ব মহাদ্বীপের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত একপক্ষের মধ্যে ভ্রমণ করা যাইবে।

১০। বোম্বাইয়ে বন্যা হইয়া রেলপথ কয়েক দিন বন্ধ হইয়াছিল।

১১। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, মহারাণী ভিক্টোরিয়া বাতরোগে মধ্যে মধ্যে ক্লেশ পাইয়া থাকেন।

১২। টম-খুড়ার কুটীর-প্রণেত্রী সুপ্রসিদ্ধ বিবী বিচার ষ্টৌর পরলোকগমন সংবাদে আমরা ব্যথিত হইলাম। আমেরিকার দাসত্ব-প্রথা বিলোপের ইনি প্রধান সহায়।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১ নদী—শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ৷৵০ আনা। নদীর পর্ব্বত হইতে উৎপত্তি হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত নাচানে সুরে সহজ পদ্যে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা শিশুদের জন্য এবং তাহাদের প্রীতি-কর হইবে।

২। ক্ষীরের পুতুল—শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ৷৵০ আনা। এটী গল্পের ভাষায় লিখিত একটী সুন্দর উপ-কথা। ইহা পাঠে পাঠক্‌পাঠিকারা পেট ভরিয়া আমোদ ভোগ করিতে পারিবেন।

৩। গৃহলক্ষ্মী, ২য় ভাগ—শ্রীগিরিজা প্রসন্ন রায় প্রণীত, মূল্য ৸০ আনা। স্বামী স্ত্রীর কথোপকথনচ্ছলে সুকৌশলে গৃহধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া এই পুস্তকের উদ্দেশ্য, এবং তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। গিরিজা বাবু অনেক দিন হইতে নৈপুণ্য সহকারে এইরূপ গ্রন্থ লিখিতেছেন। ইহা এদেশীয় রমণীদিগের যে বিশেষ উপাদেয় ও শিক্ষাপ্রদ, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

৪। পদ্যকুসুম—শ্রীনগেন্দ্র নাথ রায় প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। ইহাতে বিবিধ বিষয়ে অনেকগুলি কবিতা সুললিত ভাষায় রচিত হইয়াছে। ইহা বালক বালিকাদের পাঠোপযোগী।

৫। শ্রীহরিদাস ঠাকুর—শ্রীঅঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।৹ আনা। হরিদাস বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একজন ভক্ত-চূড়ামণি। ইঁহার জীবন অটল বিশ্বাস, কঠোর সাধনা, গভীর ভক্তি, স্বর্গীয় বিনয়, উদার প্রেম এবং অলৌকিক ত্যাগ স্বীকার দ্বারা ধর্ম্মবীরদিগের দৃষ্টান্তের স্থল হইয়া আছে। এরূপ ভক্তের জীবনী ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই পক্ষে উপাদেয়। গ্রন্থকার ইতিপূর্ব্বে কয়েকটী ভক্তের চরিতাখ্যান প্রকাশ করিয়াছেন, বর্ত্তমান গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া সাধারণের অধিকতর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার লেখনী হইতে আরও ভক্তচরিত বিনিঃসৃত হইয়া বাঙ্গালাতে একখানি সুন্দর "ভক্ত-মালের" অভাব পূর্ণ করুক।

৬। সেক্‌সপিয়র, ১ম খণ্ড—শ্রীহারাণ চন্দ্র রক্ষিত সঙ্কলিত। সাধারণ সংস্করণ মূল্য ১।৹, রাজসংস্করণ মূল্য ২৲ টাকা। কলিকাতা, ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে পাওয়া যায়।

হারাণ বাবু সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত; তাঁহার "সেক্সপিয়র" অতি উপাদেয় হইয়াছে। ইহাতে সেক্সপিয়রের আটখানি নাটক অনুবাদিত হইয়াছে। যথা—ওথেলো, মারচেণ্ট অব্ ভেনিস, রোমিও-জুলিয়েট, পেরিক্লিস, টুয়েল্‌ভ্থ নাইট, টাইমন, সিম্বলিন ও কিং লিয়র। ভাষা প্রাঞ্জল ও সরল, ভাব পরিস্ফুট। ইতিপূর্ব্বে দুই তিন খানি সেক্সপিয়রের গল্প পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ল্যাম্বকৃত সেক্সপিয়রের গল্পের অনুবাদ মাত্র। হারাণ বাবুর এ গ্রন্থ সেরূপ নহে। ইহা ল্যাম্বের আদর্শে রচিত হইলেও ইহাতে মূল সেক্সপিয়রের উৎকৃষ্ট অংশ সকল স্থান পাইয়াছে এবং সর্ব্ব প্রকারে পুস্তক খানি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। সুন্দর কাগজে, সুন্দর অক্ষরে এবং ২২খানি সুন্দর চিত্রসহ মুদ্রিত হইয়া পুস্তকের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ভূমিকায় সেক্সপিয়রের সম্বন্ধে একটী সুন্দর সমালোচনা আছে। হারাণ বাবু দ্বারা সমস্ত সেক্‌সপিয়ার এইরূপ আকারে প্রকাশিত হইলে ইহা বঙ্গভাষায় মূল্যবান্ সম্পত্তি হইবে। বঙ্গীয় মহিলাগণ এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইবেন।

৭। হিতকথা—শ্রীশশিভূষণ সেন প্রণীত, মূল্য ৵৹ আনা। এই পুস্তকখানিতে বালকবালিকাদিগের দেহ, মন ও আত্মার উন্নতি সাধন দ্বারা সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষাদানের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা এবং তাহা এদেশে সম্যক্ প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। প্রবন্ধটী চিন্তাপূর্ণ এবং ইহার ভাষা প্রাঞ্জল। হিতকথা বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য।

বামারচনা।

আবাহন।

কে তুমি বেড়াও কেন,
গাহিয়া বিষাদ-গান ?
কি আঘাতে বল ভাই
ভেঙেছে তোমার প্রাণ ? ১
"সুখ সুখ" ক'রে কেন
আকুল পিপাসী প্রায়,
হায় সথে বারি ভ্রমে
ছুটিতেছ সাহারায় ? ২
কারে তুমি 'সুখ' বল
তাহারে কি চেন ভাই,
'সুখ' সে কেমন-ধারা ?
আমি তারে দেখি নাই। ৩
আমি জানি কথা দু'টি
আকাশ-কুসুমপ্রায়,
'সুখ' নামে এ জগতে
কিছুই নাহিক হায়! ৪
তাই তারে নাহি খুঁজি,
মিছা খুঁজে কি বা ফল ?
পরের হাসিতে আমি
ঢেকে রাখি অশ্রুজল। ৫
তুমি যারে 'সুখ' বল
সে নহেত সুখ, ভাই!
কেঁদ না তাহার তরে
সে শুধু মোহের ছাই।৬
তবে গো আকুল কেন
মোহ মদিরার তরে ?
কেন আর ছুটা ছুটি—
মিছা 'সুখ সুখ' ক'রে ?৭
আমিও তোমার মত
সুখের কাঙাল ভাই,
আইস দুজনে মিলে
একপথে ছুটে যাই।৮
আমিও জগতে একা
নিয়ত কাঁদিয়া মরি,
পাই না প্রাণের সখা
কাঁদিতে গো গলা ধরি।৯
হও তুমি সখা মোর
করি আমি আবাহন,
এস গাই বিভু-গুণ
এক করি' দুটি মন। ১০
এ জগৎ দুদিনের
কেন ক্ষোভ তাপ তায় ?
নিত্য সুখ কোথা এস
খুঁজে দেখি দু'জনায়। ১১
সংসারের মায়া মোহ
সব পায়ে দলি ভাই,
আইস অনন্ত দেশে
অনন্তে মিশিতে যাই। ১২
কেবল কাঁদিতে মোরা
আসিনি জগতে ভাই,
আছে জীবনের কাজ
তাকি কিছু মনে নাই ?১৩
মিশায়ে প্রাণের ব্যথা
বিশাল জগৎ গায়,

নবোদ্যমে জগতেতে
খাটি এস পুনরায়। ১৪
মাথা খাও আর সখে!
গেও না বিষাদ-গান,
বিশ্ব-সেবা ব্রতে এস
দোঁহে ঢেলে দিই প্রাণ। ১৫

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী,
হুগলী।

সিন্ধু।

বিজন পয়াণ মাঝে কি বাসনা জেগে আছে,
সতত যাচিছে সিন্ধু কাহার দর্শন?
যেন গো কাহার তরে বিপুল বিরহ ভরে
অধীরে ছিঁড়িতে চায় বেলার বন্ধন।
ধরিতে ছায়াটি কার বিশাল হৃদয় তার
বিছায়ে রেখেছে সদা করিয়ে যতন।
সুমন্দ গভীর স্বরে, কভু বা উচ্ছ্বাস ভরে,
গাহে সিন্ধু যেন কার মহা স্তবগীতি।
কভু বা যোগীর মত থাকে গো ধেয়ানে রত
অন্তরে গুমরি উঠে যেন কার স্মৃতি!
কভু অভিমান ভরে, পড়ে থাকে এক ধারে,
চাহে না জানাতে যেন মরমের কথা।
কভু বা আকুল প্রাণে, ডাকে কারে কলস্বনে,
শুনাইতে যেন শত পরাণের ব্যথা।
কভু বা উথলি উঠে, যেন গো পড়িতে লুঠে
পরাণ ঢালিয়া হায় চরণে কাহার,
মুহূর্ত্তে স্বপন হায় যখন টুটিয়া যায়
কাঁদিয়া ভগন প্রাণে করে হাহাকার॥

শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু।

অনুকম্পা।

ওগো দয়া কর—
এলমেল কেশ বাস, অধরে নাহিক হাস,
রোগে শোকে জ্বলিতেছে তাপিত অন্তর,
সবে মোরে দয়া কর—
শরীরে লেগেছে কাদা, রক্তশূন্য মুখ সাদা,
ক্ষুধায় অগ্নির সম পুড়িছে উদর
দয়া কর, দয়া কর—
শত ছিন্ন বাস পরা, কত কষ্টে আছি খাড়া,
দারুণ মাঘের শীতে কাঁপি থর থর,
দয়া কর, দয়া কর—
গৃহ নাই চোখ্ কানা, ঘরে নাই এক দানা,
বিষম বার্দ্ধক্য রোগে জীর্ণ কলেবর,
দয়া কর, দয়া কর—
দারুণ দারিদ্র্য দোষে, এসেছি তোমার পাশে
যা থাকে খাবার দাও প্রসারিয়া কর,
আহা দয়া কর, দয়া কর—
মোর পিতা মাতা ছিল, কত ছিল ভাল ভাল,
আজি ভাগ্যদোষে মোর সবে পর পর।
তোরা মোরে দয়া কর—
পিধনে মলিন-বাস, মাথে চুল এক রাশ,
গায়ে আবরণ নাই রাত্রি দ্বিপ্রহর,
দয়া কর, দয়া কর,—

পিতা মাতা ভ্রাতা হারা, জীয়স্তে মৃতের পারা,
কাঙ্গাল দুয়ারে পড়ি ডাকে নিরন্তর,
দয়া কর, দয়া কর,—
উষাকালে এ অভাগা, লাঠি হাতে মাজা বাঁকা,
বাহির হয়েছে এবে রাত্রি দ্বিপ্রহর,
করঙ্ক লইয়া করে, সকলের ঘরে ঘরে,
ফিরিলাম সবে বলে সর,—সর সর।
সাত ছেলে দুই মেয়ে, কবরে রয়েছে শুয়ে,
সেই যে শশ্মান-ভূমি চক্ষের উপর,
সে সমাধি—সে শশ্মান, শুধু এ অন্ধের প্রাণ,
সে স্তম্ভ পরশ করি জুড়াই অন্তর।
পথাপথ নাহি জ্ঞান, ছটফট করে প্রাণ,
আসিয়াছি তবাশ্রয়ে দীনে দয়া কর,
যা আছে তা দাও খেতে, অন্ধে কিছু দাও শুতে,
আমারে আপনা কর ভুলি পরাপর।
প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, ডাকিগো প্রাণের দায়,
ওই যে শুনিতে পাই হাসির লহর,
দ্বিতল দালান হতে, আসিছে বাহির পথে,
মাষ্টুকেন পুষ্টারবান্ আমি অন্ধ নর,
ওগো দয়া কর,—
চোর নই দস্যু নই, শপথ করিয়া কই,
এই দেখ কাঁপিতেছে ক্ষুধায় উদর,
দয়া কর, দয়া কর—
সারা দিন খাই নাই, তাই আসিয়াছি ভাই,
হাতাড়িয়া অতি কষ্টে হয়ে অগ্রসর।
দয়া কর, দয়া কর,
তুমিত খেয়েছ ভাই, খেয়ে দেয়ে তোল হাই,
অন্যে অন্ন দিতে কেন এতই কাতর?
এ অনন্ত বিশ্বমাঝে, আমার কি কেহ আছে?
এ নিশীথে অন্ধজনে প্রসারিবে কর,
অথবা এ বসুন্ধরা,, কেবলি আঁধারে ভরা,
যত জীবদল সব নিরেট পাথর!
না—না—না—না মিথ্যা কথা, এ বিশ্বের রচয়িতা
রয়েছেন তিনি অতি দয়ার সাগর।
তাঁর প্রেমে অবিরল, ভাসিছে অবনীতল,
সে স্নেহে কি বাঁচিবে না এই অন্ধ নর,—
একজন মহারাণী, শুনি সে কাতর বাণী,
রজত থালায় অন্ন, করি ভরপুর
সঙ্গে এক দাসী লয়ে, বাহির হইল ধেয়ে,
যেথানে কাঙ্গাল আছে অতিদূর-দূর।
মধুস্বরে আশ্বাসিয়া, অন্ধে দিল খাওয়াইয়া,
খাওয়াইল কত মণ্ডা ক্ষীর ননী সর,
অঙ্গে আবরণ দিল, হিতাহিত জিজ্ঞাসিল,
বহিল অন্ধের নেত্রে আনন্দ-শিকর।
উদরেতে অন্ন গেল, শরীরে সামর্থ্য হলো,
ভাবিল এ ঈশ্বরের প্রেরিতা রমণী—
কহিল "কে প্রাণ দিলি, আয় দে মা পদ ধুলি,
ধনীর কুমারী তুই আরো হ মা ধনী।
ধরিয়া অন্ধের হাত, কহিল এস হে তাত,
রাজার ঘরের আমি প্রধানা মহিষী,
ত্রিতলে গবাক্ষ দিয়ে, থাকি পথ তাকাইয়ে,
কাঙ্গাল গরীব আমি বড় ভালবাসি।
তদবধি রাজমাতা, অন্ধের হইল ত্রাতা,
নিজ ব্যয়ে করি এক মন্দির স্থাপন,
টাকা কড়ি লোক জন, কত দিল অগণন,
সচ্ছন্দে করিল অন্ধ জীবন যাপন।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাসী।

বঙ্গমহিলাগণের রচনার নিমিত্ত বাবু ব্রজমোহন দত্ত স্থাপিত পারিতোষিক।

১৮৯৬।৯৭ অব্দের জন্য বাবু ব্রজমোহন দত্তের দেয় ৪০৲ টাকা পারিতোষিকের নিমিত্ত নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে "একান্নবর্ত্তী হিন্দু-পরিবার-ভুক্ত স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য।"

পারিতোষিক দানের নিয়ম।

(১) বঙ্গমহিলা মাত্রেই পারিতোষিক-প্রার্থিনী হইতে পারিবেন ; এতৎসম্বন্ধে বয়সের কোন নিয়ম নাই।

(২) পারিতোষিকপ্রার্থিনীগণকে বঙ্গ-ভাষাতেই হউক বা সংস্কৃত ভাষাতেই হউক কোন একটি নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।

(৩) এই বিজ্ঞাপন প্রচারের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে প্রবন্ধগুলি বিচারের জন্য সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্টবুক কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক প্রবন্ধের সহিত পারিতোষিকপ্রার্থিনীর স্বামী, পিতা বা অন্য অভিভাবককে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া পাঠাইতে হইবে যে, তাঁহার বিশ্বাসমতে, রচয়িত্রী, ঐ প্রবন্ধ রচনা-কালে, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে কোন প্রকার সাহায্যই গ্রহণ করেন নাই।

১৮৯৬ অব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টরের আফিসে, সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্টবুক কমিটির সম্পাদক মহাশয়ের নামে এই প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। এই প্রবন্ধের মোড়কের (কভারের) উপর "ব্রজমোহন দত্ত পারি-তোষিকের রচনা" এইরূপ লিখিত থাকিবে। যাঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, কলিকাতা গেজেটে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবে।

যিনি একবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে অন্য বৎসর পুনর্ব্বার প্রবন্ধ রচনা করিতে পারেন। যদি তাঁহার রচনা সে বারেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহার নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পারি-তোষিক, রচনার গুণানুসারে তাঁহার পরবর্ত্তিনী মহিলাকে প্রদত্ত হইবে।

যদি বিচারকগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনাটিকেও পারিতোষিকের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে না।

এ, ক্রফ্‌ট,

বাঙ্গালা দেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর।

কলিকাতা, ২০শে জুন ১৮৯৬।

No. 380. September, 1896.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৮০ সংখ্যা। ভাদ্র, ১৩০৩—সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬। ৬ষ্ঠ কল্প। ১ম ভাগ।

বামাবোধিনীর চতুস্ত্রিংশ জন্মোৎসব।

যস্মাদর্ব্বাক্ সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে।
তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্।

যাঁহার শাসনে কালচক্র নিরন্তর
ঘুরিতেছে—অহোরাত্র মাস সংবৎসর,
অমৃত জ্যোতির জ্যোতি, আয়ুর কারণ
জানিয়া নিয়ত তাঁরে পূজে দেবগণ।

মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরের অপার কৃপায় বামাবোধিনী শতাব্দীর তৃতীয়াংশ অতিক্রম করিয়া অর্দ্ধ শতাব্দীর পথে অগ্রসর হইল, ইহার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তি-ভরে তাঁহারে চরণে প্রণাম করি। দেবতারা সেই জ্যোতির জ্যোতি অমৃত পুরুষে যুক্ত হইয়া অমর হইয়াছেন এবং তাঁহাকে আয়ুর কারণ জানিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত-মনে নিয়ত তাঁহার উপাসনা করিতেছেন; তিনি আমাদিগকে তাঁহার সহিত যুক্ত করিয়া অমর দেব-জীবনের অধিকারী করুন্।

বামাবোধিনী ৩৩ বৎসর জীবন ধারণ করিয়া ঈশ্বরের করুণার দুইটী উজ্জ্বল সাক্ষ্যদানে সমর্থ—একটী তাঁহার করুণাই ইহার আয়ুর কারণ; দ্বিতীয় তাঁহার করুণাই স্ত্রীজাতির উন্নতির কারণ।

বামাবোধিনী যখন জন্ম গ্রহণ করে, তখন কখনও আশা করা যায় নাই যে, ইহা এত দীর্ঘজীবিনী হইবে। ইহার জীবন-পথে পদে পদে যেরূপ বিঘ্ন বিপত্তি, বিভীষিকা ও পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে ভগবানের শুভ ইচ্ছা ইহার পশ্চাতে না থাকিলে ইহা কোন্ কালে বিনাশ প্রাপ্ত হইত। সেই বিঘ্নহারী বিপদকাণ্ডারী ইহার সকল বিঘ্ন দূর করিয়াছেন এবং ইহার যখন যে অভাব হইয়াছে, তাহা আশ্চর্য্যরূপে পূর্ণ করিয়া-ছেন। বামাবোধিনীর ক্ষুদ্র জীবন দ্বারা নারীকুলের ও জনসমাজের যে কিছু

হিতসাধন হইয়াছে, তাহার প্রবর্ত্তক ও সহায় তিনি।

বামাবোধিনীর জন্মকালে স্ত্রীজাতির অবস্থা যেরূপ ছিল এবং আজি যাহা হইয়াছে, তাহাতে যুগান্তর লক্ষিত হয়। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে সাধারণের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা দূষণীয় বলিয়া সংস্কার ছিল এবং এই কুসংস্কার অপনোদন জন্য কত যুক্তি তর্ক প্রয়োগ করিতে হইত। আজি এ দেশ স্ত্রীবিদ্যালয়ে ছাইয়া গিয়াছে—এমন নগর ও গণ্ডগ্রাম নাই, যেখানে বালিকা-বিদ্যালয় নাই। এক কলিকাতা সহরে এদেশীয়া বয়স্থা মহিলাদের জন্য ৩টী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে, তদ্ভিন্ন খ্রীষ্টীয় মহিলা-বিদ্যালয় অনেকগুলি রহিয়াছে। মহিলারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষা সকলে প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কেবল সাহিত্য দর্শনে নয়, ব্যবহার ও চিকিৎসা-শাস্ত্রেও স্ত্রীগণ পারদর্শিতা লাভ করিতেছেন। বোম্বাইয়ের এক পারসী রমণী ব্যারিষ্টারী (ওকালতী) করিতেছেন। এখন স্ত্রীলোকেরা শিক্ষাবিষয়ে পুরুষদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন কি না? সে প্রশ্ন নাই, কিন্তু তুল্যাবস্থায় পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন কি না? এই সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। স্ত্রী-কবি, স্ত্রী-গ্রন্থকর্ত্রী, স্ত্রী-পত্রিকা-সম্পাদিকা বঙ্গ সাহিত্যে সুযশ লাভ করিয়াছেন। ইউরোপীয় সাহিত্যক্ষেত্রেও কেহ কেহ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষক ও ধর্ম্মপ্রচারিকার সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। দেশভ্রমণ, সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি সাহসিক কার্য্যেও রমণীরা পশ্চাদ্বর্ত্তিনী নহেন। কেবল বঙ্গদেশে নয়, পঞ্জাব ও দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি ভারতের সর্ব্ব প্রদেশেই স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির উন্নতিকর বিবিধ অনুষ্ঠান দর্শনে আমাদের আশা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। উন্নত স্ত্রী-চরিত্র বিকসিত হইয়া তাহার সৌরভে ভারতকে আমোদিত করিতেছে। এ সকলের মধ্যে ভগবৎশক্তি কার্য্য করিতেছে, কাহার সাধ্য তাহাকে প্রতিরোধ করে? এই দৈবশক্তি স্ত্রীজাতির উন্নতির সকল অন্তরায় চূর্ণ করিয়া ভারতবাসিনীদিগকে এক মহাশক্তিরূপে গঠন করিয়া পতিত সমাজের উদ্ধার সাধনের সহায়তা করিবে।

বামাবোধিনী স্ত্রীজাতির উন্নতির সাক্ষ্য দিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে এ কথা বলিতে পারেন যে, সভ্য ইউরোপীয় ও আমেরিক সমাজে স্ত্রীজাতি ক্রমশই অতি উচ্চপদে আরূঢ় হইতেছেন। তাঁহারা কেবল শিক্ষাবিষয়ে ও গৃহকার্য্যের পারিপাট্যে আদর্শস্থল নহেন, সমাজের সর্ব্ব প্রকার হিতসাধনে রমণী প্রধান সহায়। মহাসভা পার্লেমেণ্টের অনেক রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যেও রমণীর হস্ত সুস্পষ্ট দেখা যায়, সমাজের দুর্নীতি নিবারণ এবং বিশ্বসেবাব্রত অনুষ্ঠানে সহস্র সহস্র রমণী দলবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতেছেন। পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী যে রমণী, সেই রমণীর সহায়তা ভিন্ন সমাজসংগঠনকার্য্য কখনই পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। ইহার শত শত প্রমাণ তাঁহারা

প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা আশা করি, ভারতরমণীগণ সুশিক্ষা ও সদাচার দ্বারা যেমন গৃহের শ্রীস্বরূপা হইবেন, তেমনি সমাজের কল্যাণ ও উন্নতিসাধনে পুরুষদিগের সহকারিণী হইয়া তাঁহাদের জীবনের মহত্ত্বের পরিচয় দিবেন। জগদীশ্বর বামাবোধিনীর অনেক আশা পূর্ণ করিয়াছেন, আরও যে নূতন নূতন আশা ইহার প্রাণে সঞ্চার করিতেছেন, তাহাও সফল করুন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লক্ষদ্বীপ—ষ্টেট্ সেক্রেটারীর অনুমতি অনুসারে ইহা মালাবারের মহ্লালারাজ আলি রাজাকে প্রত্যর্পিত হইবে।

কৃষ্ণার বন্যা—সম্প্রতি কৃষ্ণানদীর জলপ্লাবনে প্রায় একশত মাইল দেশ ভাসিয়া গিয়াছে। এই জল এত গভীর যে, তাহার উপর দিয়া বাষ্পীয় পোত যাতায়াত করিতেছে। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এরূপ বন্যা দেখা যায় নাই। অনেক লোক মারা গিয়াছে, রাজপুরুষদিগের যত্নে কতক লোকের উদ্ধার হইয়াছে।

রুশ সম্রাটের ভ্রমণ—রুশিয়ার জার সস্ত্রীক ভারেনা ও ইউরোপের অন্যান্য নগর দর্শন করিবেন।

বঙ্কিম স্মৃতিফণ্ড—স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ ফণ্ডে পাঁচ হাজার টাকার অধিক উঠিয়াছে।

জাপান সম্রাটের জীবনরক্ষা—সম্প্রতি জাপান-সম্রাট সৌভাগ্যবলে রেলওয়ে গাড়ীর ধাক্কা হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন।

রাজকন্যা মডের বৃত্তি—ইনি বার্ষিক ৪০০০ হাজার পাউণ্ড এবং ইহার স্বামী দশ বার হাজার পাউণ্ড ভাতা পাইয়াছেন।

সেতুভঙ্গ—জব্বলপুর ও ইতার্সীর মধ্যবর্ত্তী সেতু হঠাৎ ভগ্ন হওয়াতে বোম্বাইয়ে রেল গাড়ী যাওয়ার ব্যাঘাত হইয়াছে। কলিকাতার গাড়ী সকল নাগপুর লাইন দিয়া বোম্বাই যাইতেছে।

ক্রীটে বিদ্রোহ—মুসলমানগণ ক্রীট-দ্বীপবাসী কতকগুলি খ্রীষ্টানকে হত্যা করাতে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। গ্রীসবাসিগণ প্রাণপণে ইহাদিগকে সাহায্য করিতেছেন।

গ্রীষ্মে মৃত্যু—আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক সহরে এ বৎসর এত গ্রীষ্মাধিক্য হইয়াছে যে, ৫ দিনে ১২০ জন লোক সর্দ্দি-গরমি হইয়া মরিয়াছে।

মহারাণীর রাজত্বোৎসব—ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব ৬০ বৎসর চলিয়াছে। অনেকের ইচ্ছা ছিল এই সেপ্টেম্বর মাসে এইজন্য উৎসব হয়; কিন্তু মহারাণী জানাইয়াছেন যে, ৬০ বৎসর পূর্ণ না হইলে এ উৎসব হইবে না। এখনি ইউরোপীয় সকল রাজার অপেক্ষা তিনি অধিক দিন রাজত্ব করিয়াছেন।

ছোট লাটের ভ্রমণ—সার আলেক-জাণ্ডার মেকেঞ্জি রাজসাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল প্রভৃতি উত্তর ও পূর্ব্ব বাঙ্গালার অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন এবং দেশের হিতকর অনেক কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন।

ক্ষয়কাশে মৃত্যু—ইউরোপে প্রতিবৎসর এই রোগে দশ লক্ষেরও অধিক লোক মারা যায়। এক চিকিৎসক আবিষ্কার করিয়াছেন, ওজন নামক বাষ্প আঘ্রাণ করিলে এই রোগ আরোগ্য হয়।

দান—নিসয়ে যে সোয়াকিম-যুদ্ধ হইতেছে, তাহার ব্যয়ভার ভারতের উপর পড়িয়াছে। বিজয়নগরমের মহারাজা এই উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টকে এক লক্ষ টাকা দিতে চাহিয়াছেন। অন্যান্য রাজা মহারাজা এইরূপ মুক্তহস্ত হইলে ভারতবাসিগণ বাঁচিয়া যান, দানেরও খ্যাতি প্রচার হয়।

লণ্ডনে এদেশীয় ছাত্রগণের জন্য ব্যবস্থা—লণ্ডনে ন্যাসনাল ইণ্ডিয়ান নামক একটী সভা আছে। কুমারী ম্যানিং ইহার সম্পাদিকা এবং এইচ্‌ থরনটন ইহার সভাপতি। ভারতের ছাত্রগণ অভিভাবক অভাবে ক্লেশ না পায় এজন্য ইহাঁরা সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

মেয়ে টিকিট-কলেক্টার—ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে মেয়ে টিকিট-কলেক্টারের ব্যবস্থা করিয়া এদেশের স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ সুবিধা করিয়াছেন।

বেথুন-স্মৃতি—গত ১২ই আগষ্ট মহাত্মা বেথুন সাহেবের স্বর্গারোহণের দিন তাঁহার সমাধিস্থলে বেথুন কলেজের লেডী-প্রিন্সিপাল শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু এম এ-র সহিত অনেকগুলি শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রী মিলিত হন; বেথুনের অনুরক্ত কতকগুলি পুরুষও তথায় উপস্থিত হন। সঙ্গীত ও প্রার্থনা হয় এবং শ্রীমতী মানকুমারীর লিখিত "বেথুনের স্মৃতি-পূজা" কবিতা পঠিত হয়। কবিতাটী স্থানান্তরে দৃষ্ট হইবে। এই শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার পর সকলে কবিবর মাইকেলের স্মৃতিস্তম্ভ প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার সম্মাননা করেন।

মৃত্যুগৌতমী সংবাদ।

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে মনুষ্যের কর্ম্মফল সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে। যদিও উহার সমস্ত ভাবের সহিত আমরা সায় দিতে পারি না, তথাপি আখ্যায়িকাটী এমনি সুন্দর এবং গভীর উপদেশ-পূর্ণ যে, তাহা আমাদের পাঠিকাদিগকে উপহার দিবার ইচ্ছা অনেক দিন হইতে আমাদের মনে জাগরূক রহিয়াছে। আখ্যায়িকাটীর উৎপত্তি এইরূপে হইয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধ-জনিত পাপ স্মরণ করিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছিলেন এবং আপনার জীবন ভারবহ বোধ হওয়ায় শরশয্যা-

শাম্নী ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে পিতামহ! জ্ঞানকৃত পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না? এবং পরজন্মে কি প্রকারে এই পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইবে?"

মহামতি ভীষ্ম তদুত্তরে বলিলেন, "হে মহাভাগ! তুমি আত্মাকে কেন এই পাপ পুণ্য কর্ম্মের কর্ত্তা মনে করিতেছ? আত্মা পরতন্ত্র। আত্মা যন্ত্রস্বরূপ, ঈশ্বর যন্ত্রী। এই তত্ত্ব অতীব নিগূঢ় বলিয়া আমরা সহজে উপলব্ধি করিতে পারি না।" এই কথা বলিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে এক প্রাচীন আখ্যায়িকা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

পুরাকালে গৌতমী নামে এক শমগুণান্বিতা স্থবিরা ব্রাহ্মণী ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র সর্পদংশনে মৃত হইয়াছে দর্শন করিয়া চিন্তামগ্না আছেন, এমন সময়ে অর্জুনক নামক জনৈক ব্যাধ ঐ সর্পকে রজ্জুদ্বারা বদ্ধ করিয়া তাঁহার নিকট আনয়ন করতঃ বলিল "হে মহাভাগে! এই সর্প তোমার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে, অতএব কি প্রকারে ইহার দণ্ডবিধান করিব তুমি শীঘ্র বল। ইহাকে কি খণ্ডখণ্ড করিব, না অগ্নিতে দগ্ধ করিব? এই শিশুহন্তা পাপিষ্ঠকে আর অধিক ক্ষণ জীবিত রাখা কর্ত্তব্য নহে।" ইহা শুনিয়া গৌতমী কহিলেন, "ব্যাধ! তুমি অজ্ঞান, তুমি এই সর্পকে পরিত্যাগ কর। কোন্ জ্ঞানবান ব্যক্তি প্রাপ্তব্য বস্তুর চিন্তা না করিয়া আত্মাকে পাপ-ভারাক্রান্ত করে? ভেলা যেমন জলে ভাসমান থাকে, পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা যাহাদের আত্মা লঘু হইয়াছে তাহারা সেইরূপ সংসারসাগরে ভাসমান থাকে; কিন্তু পাপভারাক্রান্ত ব্যক্তিগণ তাহাতে নিমগ্ন হয়, যেমন গুরুবস্তু জলে মগ্ন হইয়া যায়। এই সর্পকে বিনাশ করিলে আমার পুত্র জীবিত হইবে না এবং ইহা জীবিত থাকিলে আমার কোন ক্ষতি হইবে না, অতএব এই প্রাণবিশিষ্ট জীবকে বধ করিয়া কে অনন্ত মৃত্যুলোকে গমন করিবে?"

ব্যাধ কহিল "হে গুণাগুণজ্ঞে দেবি! আমি জানি, জ্ঞানী লোকেরা দয়াস্বভাব বশতঃ সকলের দুঃখে দুঃখী হন; কিন্তু তুমি যে উপদেশ প্রদান করিলে তাহা শোকহীন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। তুমি পুত্রশোককাতরা, তোমার মুখে এ উপদেশ শোভা পায় না। অতএব আমি এই ক্ষুদ্র ভুজঙ্গকে বিনাশ করিব। শান্তিপরায়ণগণ বলেন যে, কালই সকল ঘটনার কারণ, সুতরাং তাঁহারা এই শমগুণ দ্বারা শোক জয় করেন, কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তিগণ শত্রু বিনাশ করিয়া আশু শোকমুক্ত হয় এবং নিত্যমোহাধীন ব্যক্তিরা শ্রেয়স্কর হইলে শোকগ্রস্ত হয়। অতএব আমি ভুজঙ্গকে বিনাশ করিয়া তোমার শোক নিবারণ করি।"

ব্রাহ্মণী বলিলেন, "অর্জ্জুনক! আমার ন্যায় ব্যক্তির দুঃখ নাই। ধর্ম্মাত্মারা সর্ব্বদাই সজ্জন হন। আমার পুত্র কালের অধীন, কালই তাহার মৃত্যুর কারণ,

অতএব এই সর্পকে বিনাশ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের কোপ নাই, তবে কোপজনিত যাতনা কোথা হইতে হইবে? অতএব হে ব্যাধ! তুমি এই সর্পকে দয়াগুণে ক্ষমা করিয়া মোচন কর।" ব্যাধ কহিল, সুভগে! অরাতিবধ দ্বারা যে লাভ হয়, তাহা অক্ষয়। যজ্ঞে বলিদান করিলে যেমন যজ্ঞকর্ত্তা ও পশু উভয়ের স্বর্গলাভ হয়, তদ্রূপ শত্রুবধ দ্বারা মনুষ্যের পরলোকে প্রশস্ত লাভ হইয়া থাকে। এই কুৎসিত অপকারী পন্নগের বিনাশে যে লাভ হইবে, তাহা কি শ্রেয়ঃ নহে? গৌতমী বলিলেন, "গৃহীত শত্রুকে বধ করিয়া কি প্রীতি হয় এবং প্রাপ্ত শত্রুকে মুক্ত না করিলে কি কামনা সিদ্ধ হয়? অতএব হে সৌম্য! কিজন্য আমি এই ভুজঙ্গকে ক্ষমা না করিব এবং কেনই বা ইহার মোচনার্থ যত্ন না করিব?" লুব্ধক বলিল, "হে গৌতমি! এই একজনের জীবন সংহার করিলে অনেকের জীবনরক্ষা হইবে, অনেকের প্রাণরক্ষার প্রতি উপেক্ষা করিয়া একজনের প্রাণরক্ষা করা উচিত নহে। ধর্ম্মবিদ্ ব্যক্তিগণ অপরাধীকে ত্যাগ করেন, অতএব তুমি এই পাপাত্মা সরীসৃপকে হনন কর।" গৌতমী বলিলেন, "হে লুব্ধক! এই সর্পকে বিনাশ করিলে আমার পুত্র জীবিত হইবে না, এবং ইহাকে বধ করিলে অন্য কোন ইষ্টসিদ্ধি হইবে না, অতএব হে ব্যাধ! এই জীবিত সর্পকে তুমি মোচন কর।" ইহা শুনিয়া ব্যাধ কহিল, দেবরাজ বৃত্র হনন করিয়া শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং রুদ্র যজ্ঞনাশ করিয়া যজ্ঞভাগ লাভ করিয়াছিলেন, মহাদেবও এইরূপে যজ্ঞভাগ পাইয়াছিলেন, অতএব তুমি দেবতাদিগের অনুকরণ করিয়া শীঘ্র এই সর্পকে সংহার কর, ইহাতে শঙ্কা করিও না।"

ব্যাধ এইরূপে ভুজঙ্গবধের জন্য নানা প্ররোচনা-বাক্যে গৌতমীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও সেই মহাপ্রাণা যখন পাপকর্ম্মে সম্মত হইলেন না, তখন সেই পাশপীড়িত সর্প কিঞ্চিৎ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৃদুস্বরে ব্যাধকে কহিল, "হে মূঢ় ব্যাধ! এই ঘটনাতে আমার দোষ কি? আমি পরাধীন, আমার নিজের কোন ক্ষমতা নাই। মৃত্যু আমাকে এই কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন, আমি তাঁহারই আজ্ঞায় এই শিশুকে দংশন করিয়াছি। আমি নিজ ইচ্ছায় অথবা ক্রোধপরবশ হইয়া দংশন করি নাই। অতএব এই শিশুর বিনাশ জন্য মৃত্যুই অপরাধী।" ব্যাধ কহিল, "ভুজঙ্গ! যদিও তুমি অন্যের আদেশে এই পাপ কর্ম্ম করিয়া থাক, তথাপি তুমিও ইহার অন্যতর কারণ এবং এজন্য তুমিও দোষী। যেমন মৃন্ময় পাত্র নির্ম্মাণের জন্য দণ্ড ও চক্র কারণ, তুমিও সেইরূপ কারণ। আমি অপরাধীকেই হত্যা করিব, তুমি অপরাধী, যেহেতু তুমি স্বয়ং আপনাকে অন্যতর কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছ।" সর্প কহিল, দণ্ড-

কারের দণ্ড ও চক্রের স্থায় আমি পরবশ, সুতরাং আমাকে দোষী মনে করিতে পার না। আর যদিও আমাকে দোষী মনে কর, তবে কেবল আমি একা দোষী নহি। দণ্ড চক্রাদি যেমন পরস্পর পরস্পরের প্রযোজক, সেইরূপ আমি, কাল ও মৃত্যু আমরা তিন জনেই পরস্পরে পরস্পরের প্রযোজক। সুতরাং আমাদের পরস্পরে পরস্পরের কার্য্য কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে এবং সকলকেই দোষী গণনা করিতে হইবে।” ব্যাধ কহিল, “যদি তুমি প্রধান কারণ না হও এবং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কার্য্য না করিয়া থাক, তথাপি মৃত্যুর কারণ তুমি। সুতরাং তুমিই বধার্হ। অসৎকর্ম্ম করিয়াও যদি কর্ত্তা তাহাতে লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে কেহই কারণ হইতে পারে না। অতএব তুমিই বধ্য, বৃথা কেন বহু বাক্যব্যয় করিতেছ?” সর্প বলিল, “কারণ বর্ত্তমান থাকুক আর না থাকুক, কার্য্যাভাবে ক্রিয়া হয় না, অতএব এই সমহেতু পক্ষে আমার কারণত্ব বিশেষ বিবেচনীয়। হে লুব্ধক! যদি আমি কারণ হই, তবে আমার যে প্রেরক, সেই এ জীবহত্যার পাপে লিপ্ত হইবে।” ব্যাধ বলিল, রে দুর্ব্বুদ্ধি বালঘাতী নৃশংস পন্নগাধম! তুই আমার বধ্য, কেন বৃথা বহুভাষণ করিতেছিস্।” ভুজঙ্গ কহিল, “ব্যাধ! যেমন ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিয়া তাহার ফলভাগী হয় না, আমিও সেইরূপ এই পাপের ফলভাগী হইব না।”

সর্প ও ব্যাধের এই তর্ক বিতর্কের সময় মৃত্যু তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল, “হে ভুজঙ্গ! আমি কাল দ্বারা প্রেরিত হইয়া তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি, সুতরাং তুমি অথবা আমি এই শিশুর মৃত্যুর কারণ নহি। বায়ু যেমন মেঘকে চালিত করে, তদ্রূপ আমিও কাল দ্বারা চালিত। সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা চালিত হইয়া জীবসমূহ যে কর্ম্ম করে, তাহা কালের বশীভূত। স্থাবর জঙ্গম সকলেই কালের অধীন। সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডই কালময়। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এবং ইহাদের বিকৃতি সমুদায় কালের অধীন। আদিত্য, চন্দ্রমা, বিষ্ণু, জল, বায়ু, ইন্দ্র, অগ্নি আকাশ, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি সমস্তেরই পুনঃ পুনঃ কালে সৃষ্টি ও সংহার হইতেছে। হে সর্প! তুমি এ সমস্ত জানিয়াও কেন আমাকে দোষী মনে করিতেছ? যদি আমি দোষী হই, তাহা হইলে তুমিও দোষী।” সর্প বলিল, তুমি দোষী কি নির্দ্দোষী তাহা আমি বলি নাই, কিন্তু তোমার আজ্ঞাতেই আমি এই শিশুকে দংশন করিয়াছি, ইহাই আমি বলিতেছি। কাল দোষী কি না, তাহা আমাদের পরীক্ষা করিবার অধিকার নাই। তোমার দোষ মোচন হইলে আমারও হইবে। মৃত্যুর দোষ না থাকিলে আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে।” তদনন্তর সর্প অর্জ্জুনককে বলিল, “তুমি এখনত মৃত্যুর বাক্য শ্রবণ করিলে, আমার কোন দোষ নাই। অতএব আমাকে পাশবদ্ধ করিয়া ক্লেশ দেওয়া

কর্ত্তব্য নহে।" ব্যাধ কহিল,"হে ভুজঙ্গম! তোমার ও মৃত্যুর উভয়ের বাক্যই আমি শ্রবণ করিয়াছি, ইহাতে তুমি নির্দ্দোষী হইতেছ না। মৃত্যু এবং তুমি উভয়ই এই শিশুবিনাশের হেতুভূত। তোমাদের উভয়কেই আমি কারণ জ্ঞান করি। অকারণকে আমি কারণ বলিতেছি না। মৃত্যুকেও ধিক্! সে সাধুদিগের দুঃখকর ও দুরাত্মা। তুমিও পাপাত্মা এবং পাপকারী, তোমাকেও ধিক্! আমি তোমাকে বধ করিব।" মৃত্যু বলিল, "আমরা কালের আজ্ঞাবহ এবং তাহারি বশে কার্য্য করিয়া থাকি। সম্যক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদিগকে দোষী বলিতে পারিবে না।" ব্যাধ বলিল, "হে মৃত্যু! ও পন্নগ! যদি তোমরা উভয়েই কালের বশ, তবে আমার হর্ষ ও ক্রোধ কেন জন্মে, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।"

মৃত্যু কহিল, "হে লুব্ধক! লোকে যে কোন কর্ম্ম করে, কালই তাহার প্রবর্ত্তক পূর্ব্বেই আমি তোমাকে এ বিষয় বলিয়াছি। আমরাও উভয়ে কালের বশবর্ত্তী ও তাহার আদিষ্ট কর্ম্মই সম্পন্ন করিয়া থাকি, অতএব আমাদিগকে কখন দোষী করিতে পার না।" এই ধর্ম্মসংশয় নিবারণার্থ কাল সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সর্প, মৃত্যু, এবং ব্যাধকে বলিলেন, "ব্যাধ! আমি, মৃত্যু বা সর্প কেহই এই শিশু-নাশ বিষয়ে দোষী নহি এবং আমরা প্রয়োজকও নহি। এই শিশুর পূর্ব্বকৃত কর্ম্মই ইহার বিনাশসাধনের জন্য আমাদিগকে নিয়োগ করিয়াছে। অন্যে ইহার মৃত্যুর কারণ নহে। এ যে কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাতেই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। কর্ম্মই ইহার বিনাশের হেতু, আমরা সকলেই কর্ম্মের বশ। কর্ম্ম পুত্রবৎ লোককে উদ্ধার করে, কর্ম্ম সম্বন্ধেই পাপ পুণ্য লক্ষণ। কর্ম্ম সকল যেমন পরস্পরকে নিয়োগ করে, আমরাও সেইরূপ। কুম্ভকার মৃৎপিণ্ডকে যে যে রূপ দিতে ইচ্ছা করে, মৃৎপিণ্ড সেই সেই রূপ ধারণ করে। আত্মকৃত কর্ম্মও সেইরূপ মনুষ্যকে কর্ম্মানুযায়ী ফল বিধান করে। যেমন ছায়া এবং আতপের পরস্পর নিত্য সম্বন্ধ, সেইরূপ আত্মকৃত কর্ম্মের জন্য কর্ম্ম এবং কর্ত্তার পরস্পর সম্বন্ধ। অতএব আমি, মৃত্যু, সর্প, তুমি এবং বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী, কেহই এই শিশুর মৃত্যুর কারণ নহে, শিশু নিজেই ইহার কারণ।"

গৌতমী বলিলেন "মনুষ্য স্বকর্ম্ম দ্বারাই গতিলাভ করে। কাল কিম্বা ভুজঙ্গ অথবা মৃত্যু কেহই কারণ নহে, সকর্ম্মের ফলে এই বালক কালক্রমে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। আমিও এরূপ কর্ম্ম করিয়াছি, যদ্দ্বারা আমার পুত্র মৃত হইল। অতএব কাল ও মৃত্যু তোমরা গমন কর এবং অর্জ্জুনক তুমি সর্পকে মুক্ত কর।"

অনন্তর কাল ও মৃত্যু প্রস্থান করিল, অর্জ্জুনক সংশয়হীন হইল এবং গৌতমীও বিশোকা হইলেন।

উদাসীনের চিন্তা।

বিনোদিনী এক শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকের পত্নী। তাঁহার স্বামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। আত্ম-প্রতিভাবলে তথায় বেশ উপার্জ্জন করিতেছেন,সুতরাং বিনোদিনীর আর্থিক কোন অভাব নাই। নগরপ্রান্তে এক দিব্য অট্টালিকায় বাস করিতেছেন। একাধিক দাসদাসী কাজ করিতেছে। আহার্য্য ও পানীয় যখন যাহা প্রয়োজন, তখন তাহা পাইতেছেন। বাড়ীতে এক সুন্দর উদ্যান, তথায় নানাবিধ ফল ফুলের গাছ রহিয়াছে। সুতরাং ইচ্ছা হইলে তথায় ভ্রমণ করিয়া চক্ষু জুড়াইতে পারেন। সুখ সুবিধার এত আয়োজন থাকা সত্ত্বেও তাঁহার মনে সুখ নাই। তাঁহার স্বামীর প্রকৃতির সহিত তাঁহার প্রকৃতির আদৌ মিল নাই। তাই প্রায়ই দুই প্রকৃতির সংঘর্ষণ হইয়া থাকে। স্বামী ঘোর বিষয়ী, সংসারাসক্ত, বিবেকবিহীন, অর্থগৃধ্নু। সংসারে যে কোন উপায়ে হউক অর্থোপার্জ্জন করিয়া ধনী বলিয়া পরিচিত হওয়া এবং উনবিংশ শতাব্দীর সুখ সুবিধা সম্ভোগ করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। পত্নীর প্রকৃতি তাহার বিপরীত। তাঁহাকে "উদাসীনী" "যোগিনী" প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিতে না পারিলেও তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটু ভাব ছিল, যে জন্য তিনি সাংসারিক কোন বিষয়েই খুব লিপ্ত হইতে পারিতেন না; তাই ধর্ম্ম কথা শুনিতে,এবং সাধুসঙ্গ করিতে বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেন। একদিন স্বামীর সহিত একটী সাংসারিক বিষয় লইয়া একটু মতান্তর হইয়াছে। পুরুষের মন কার্য্যকালে উদ্বেলিত হইলেও সে তরঙ্গায়িত ভাব বহুক্ষণ স্থায়ী হয় না, কাজের ভিড়ে পড়িলে তাহা সহজেই প্রশমিত হয়; তাই বিনোদিনীর স্বামী হাইকোর্টে যাইয়াই বাড়ীর কষ্ট ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু মহিলাদিগের মন সহজে প্রশান্ত ভাব ধারণ করে না, একবার তরঙ্গায়িত হইলে তাহা প্রশমিত হইতে হইতে বহুক্ষণ চলিয়া যায়। প্রেমাস্পদ স্বামীর সহিত সামান্য মনান্তর হইলে চোখের জলেও তাহার নিবৃত্তি হয় না। তাই বিনোদিনী স্বামীর হাইকোর্টে গমনের পর উপাধানের উপর মস্তক রাখিয়া অশ্রুজলে তাহা সিক্ত করিতেছেন। সে দিন কিছু আহার নাই। এক একবার দুর্ব্ব্যবহারের কথা মনে পড়িতেছে, আর নির্ব্বাপিত শোকাগ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে। মনে মনে কখন অদৃষ্টকে, কখন পিতা মাতার অদূরদর্শিতাকে, কখন বিবাহ-পদ্ধতিকে দোষী করিতেছেন। এমন সময় "রাম নাম সত্য হায়" ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি বাল্যকালে হিন্দুস্থানে বাস

করিয়াছিলেন। সুতরাং হিন্দুস্থানিগণ শ্মশানে শব বহিয়া লইয়া যাইবার সময় যে বাক্য উচ্চারণ করে, তাহা জানিতেন। এজন্ত "রাম নাম সত্য হায়" ধ্বনি শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিলেন। যদিও মহিলাগণের আন্দোলিত মনে সহজে অন্ত কোন চিন্তা প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয় না, তথাপি এই গম্ভীর ধ্বনি বিনোদিনীর মনে এক চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিল। তিনি মনে মনে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন "যাহার শব বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, সে গেল কোথায়? ছেলেবেলা শুনে-ছিলাম :'যেমন জলবিম্ব জলে উদয় জল হয়ে পুনঃ মিশায় জলে', এ কি সত্য সত্যই তাই? আত্মা কি জলবিম্বের মত অদৃশ্য অন্ধকার হ'তে উঠিয়া কিছুকাল থাকে, তার পর আবার অন্ধকারে মিশাইয়া যায়?" প্রশ্ন উঠিল, কিন্তু তাহার কোন মীমাংসাই হইতেছে না। স্বামীর সহিত যে মনোবাদ হইয়াছিল, সে চিন্তা ভুলিয়া গেলেন। এখন সংশয় আন্দোলন অসহ হইয়া উঠিল। ঈদৃশাবস্থায় পত্নীর স্বাভাবিক গতি স্বামীর দিকে হয়, কিন্তু বিনোদিনীর স্বামী এ সকল বিষয়ের বড় ধার ধারেন না। আত্মা থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে তাঁহার বড় আসে যায় না। যথোপযুক্ত অর্থাগম হইলেই তাঁহার আর কোন অশান্তি থাকে না। বিনোদিনী স্বামীর সম্বন্ধে নিরাশ হইলেন, কিন্তু কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে এ প্রশ্ন সকলের সদুত্তর পাইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামীর একজন সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনিও কোন অংশে তাঁহার স্বামী অপেক্ষা অল্প প্রতিভাশালী ছিলেন না। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মে তাঁহার বিলক্ষণ মতি ছিল, এ কথা স্বামীর নিকট শুনিয়া-ছিলেন। তাঁহার নাম ভবানী বাবু। তিনি যৌবনে পদার্পণ করিয়া এক সন্ন্যাসীর নিকট যাতায়াত করিতেন। সন্ন্যাসী ঠাকুরের উপদেশ তাঁহার জীবনে এক যুগপ্রলয় আনিয়া দেয়। এমন সময় তাঁহার সংসার-সাগরের একমাত্র তরণী মাতৃদেবীর মৃত্যু হয়। মাতৃহারা হইলে তাঁহাকে সংসারে বাঁধিয়া রাখিবার আর কেহ ছিল না। তিনি সুখদুঃখময় সংসারের প্রলোভন অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন। গৃহত্যাগের পরও অনেক বার বিনোদিনীর বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার স্বামীর সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেন। কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"। বিনো-দিনীর স্বামীর প্রস্তরসদৃশ হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ পড়িলেও অঙ্কুরিত হইবার সুবিধা পাইত না। বিনোদিনীর স্বামী রক্ষণশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। সুতরাং তাঁহার অন্তঃপুরে তাঁহার বন্ধুদিগের কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। কেবল ভবানী বাবুর সন্ন্যাস তাঁহার রক্ষণশীলতাকে উল্টাইয়াছিল। তিনি স্বয়ং ধর্ম্মবিহীন হইলেও স্ত্রী ধার্ম্মিকা হন, এটা অন্তরের সহিত ইচ্ছা করিতেন; সুতরাং সন্ন্যাসী ভবানী বাবুর সহিত ধর্ম্মালাপ করিতে দিতে তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না। বিনোদিনী

ভবানী বাবুকে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিয়া মনের সন্দেহ দূর করিবেন স্থির করিলেন। তাই লোক পাঠাইয়া ভবানী বাবুকে ডাকাইয়া আনিলেন। ভবানী বাবুর আসিতে একটু বিলম্ব হইল। ইত্যবসরে তাঁহার স্বামী আসিয়া পঁহুছিলেন। স্ত্রীর চোখ দুটি আর আরক্তবর্ণ নাই, নয়নজলে আর অঞ্চল সিক্ত হইতেছে না, দেখিয়া তিনি একটু আশ্বস্ত হইলেন। তৎপরে ভবানী বাবু আসিলে বিনোদিনী শব-বহনের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে আত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। বিনোদিনীর স্বামী এ সকল আলোচনা ভাল না বাসিলেও বন্ধু ভবানী বাবুর খাতিরে তথায় বসিলেন।

বিনোদিনী—দেখুন মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় যায় এবং কি অবস্থায় থাকে?

বি-স্বামী—My wife is a stark fool; she asks you a sheer nonsense. Is there anything in us called soul? The body is all in all and when body perishes nothing remains.

বিনোদিনীকে গালি দেওয়া হইল বলিয়াই ইংরেজী উক্তি। বিশেষতঃ তিনি সর্ব্বস্থলে রক্ষণশীল হইলেও এ স্থলে ষোল আনা সাহেব। মাতৃভাষার বড় ধার ধারেন না। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য অনুবাদ করিয়া দিতেছি। "আমার স্ত্রী ভাহা মূর্খ, সে তোমাকে একটা অর্থশূন্য কথা জিজ্ঞাসা কচ্চে? আমাদের মধ্যে আত্মা নামে কি কোন পদার্থ আছে? শরীরই সর্ব্বেসর্ব্বা; যখন শরীর বিনষ্ট হয়, তখন আর কিছুই থাকে না।"

ভবানী—আপনি বাঙ্গলায় কথা বলবেন, আপনার স্ত্রীত ইংরেজী বুঝেন না।

বি-স্বামী—Nasty Bengalee. I cannot express my thought well in Bengalee. However, I shall try. "ছাই বাঙ্গলা ভাষা, আমি বাঙ্গলায় আমার মনের ভাব ভাল ব্যক্ত কত্তে পারি না, যাহা হউক চেষ্টা কর্ব্ব।"

ভবানী বাবু। বিনোদিনীর প্রতি—আপনি ধর্ম্মরাজ্যের একটা জটিল প্রশ্ন তুলেছেন। বাক্যেতে ইহার উত্তর দেওয়া শক্ত। উত্তর দিবার পূর্ব্বে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, 'কোথায়' কথাটী স্থানবাচক। মৃত্যুর পর আত্মা কোন স্থানে যায় ইহা কি আপনার প্রশ্ন?

বিনোদিনী—হাঁ তাই-ই আমার প্রশ্ন।

বি-স্বামী—দেখ ভাই, আমি যা বলেছি রাইট কি না? এর মত বোকা দুনিয়ায় কি আর দুটী আছে? আরে আত্মা থাকিলেও ওটা কি বলের মত গড়াইয়া এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যেতে পারে? স্থূল বস্তুরই গতি হয়। সাইকলজিতে পড়েছি আত্মা সূক্ষ্ম বস্তু? চৈতন্য উহার ধর্ম্ম, উহার স্থানাধার নাই। তবে তার গতি কিরূপ সম্ভবপর?

ভবানী বাবু—তোমার পুথিগত বিদ্যা। ইনি আরত সাইকলজি পড়েন নাই।

তবে এঁর দোষ কি? তুমি এঁকে মিছে গাল দিচ্ছ।

স্বামীর কথা শুনিয়া বিনোদিনীর একটু চৈতন্য হইল এবং বলিলেন—তাইত, আত্মার সম্বন্ধে আমার ঐ প্রশ্নটা করা ঠিক্ হয় নি।

বি স্বামী—আত্মা যদি চৈতন্যময় বস্তু হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর পরত আর চৈতন্য থাকে না, সুতরাং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উহার বিনাশই সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে। অগ্নির ধর্ম্ম তেজ। তেজ নাই অথচ অগ্নি আছে, এ কথা কিরূপ।

ভবানী বাবু—চৈতন্য বল্লে আগে কি বুঝায়, তাহা জানা কর্ত্তব্য। তৎপরে মৃত্যুর পর উহা থাকে কি না, ঠিক্ করা যাবে।

বি-স্বামী—চৈতন্য বল্‌তে বুঝি self-consciousness—আবার একটা ইংরেজী কথা আসিল। ভাই! এর বাঙ্গলা কি?

ভবানী বাবু—আত্মজ্ঞান।

বি-স্বামী—আত্মজ্ঞান বিষয়জ্ঞানের সহিত জড়িত। মৃত্যুর পর যখন ইন্দ্রিয় সকল নিষ্ক্রিয় হয়, তখন বিষয়জ্ঞানও আর থাকে না। একটা পাতের এক পৃষ্ঠা বাদ দিলাম, অন্য পৃষ্ঠা থাকতে পারে কি? বিষয়জ্ঞান না থাকলে আত্মজ্ঞান অসম্ভব।

ভবানী বাবু—বিষয়জ্ঞানের সহিত আত্মজ্ঞানের বিকাশ হয় বটে, কিন্তু আত্ম-অস্তিত্ব বিষয়-জ্ঞান-নিরপেক্ষ। গভীর নিদ্রার সময় বিষয়জ্ঞান লুপ্ত হয়। আত্মজ্ঞানও তখন বিকশিত অবস্থায় থাকে না। তার জন্য কি বল্‌তে হবে যে, আত্মাও তখন বিনাশ প্রাপ্ত হয়? আত্মা বিনষ্ট হইলে জাগরিতাবস্থায় তাহার পুনরাবির্ভাব অসম্ভব। উহাকে পুনর্জ্জন্ম বল্‌তে হবে? এইরূপ প্রত্যেক দিন নিদ্রা-কালেই মরি এবং জাগরিতাবস্থায় বেঁচে উঠি। পুনর্জ্জন্ম হলে পূর্ব্বস্মৃতিই বা কিরূপে সম্ভবপর? আবার তুমি বলছ যে একবার মরলেই সকলের অবসান, স্মৃতি পর্য্যন্ত লুপ্ত হবে। তবেত নিদ্রা-কালে আত্মা মরে না, এ কথাই সিদ্ধান্ত কর্ত্তে হয়।

বি-স্বামী—তোমার কথা মেনে নিলেও মৃত্যুর পর যদি পূর্ব্বস্মৃতি জেগে উঠে, তাহলে স্বীকার কর্ত্তে পারি যে, মৃত্যু কেবল সুষুপ্তি মাত্র। আত্মার মরণ নাই।

ভবানী বাবু—জেগে উঠে না যে তাহার প্রমাণ কোথায়?

বি-স্বামী—প্রমাণের ভার তোমার উপর। আমি এ কথা অস্বীকার করি।

ভবানী বাবু—আত্মা আর শরীর দুই পৃথক্ বস্তু কিনা? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে শরীরের বিনাশের সঙ্গে আত্মার অবশ্য-মরণ স্বীকার করিতে কেহ বাধ্য নহে। আমি ইতিপূর্ব্বে নিদ্রার বিষয় উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছি যে, শরীরের সহিত আত্মার নৈকট্য সম্বন্ধ থাকিলেও আত্মা উহা হইতে স্বতন্ত্র। যোগিগণের ইহা প্রত্যক্ষীভূত সত্য; কারণ তাঁহারা আত্মাকে শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া অনুভব করিতে পারেন।

বি-স্বামী—তোমার কথা মত দেখছি এখন যোগী হয়ে আত্মার বিষয়ে জ্ঞান লাভ কর্ত্তে হবে। থাক ও idleness—(আবার ইংরেজি কথা) অলসতার প্রশ্রয় দিতে চাই না।

ভবানী বাবু—উহা অলসতা কিনা তাহা তোমার বল্‌বার অধিকার নেই। উহা তোমার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা। যে ক্রিয়াতে কোন লাভ নেই, লোকে সে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কল্লে উহাকে অলসতার প্রশ্রয় বলে। যোগিগণ যোগবলে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, সংসারের কল্যাণ-সাধন কর্ত্তে পারেন। যাক্ অপ্রাসঙ্গিক কথায় কাজ নেই।

বি-স্বামী—যাক, তোমাদের গেজাখুরি কথায় আর আমার কাজ নেই, এখন বিদায় হই। এই বলিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। সেদিনের কথোপকথন ওখানে থামিয়া গেল। ভবানী বাবু বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক আশ্রমে চলিলেন। চ, চ, কু।

বেথুনস্মৃতি-পূজা।

(৪৫ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে)

দেব!
সাধি শুভ জীবনের কাজ,
আরাম লভিছ হেথা তুমি,
তাইতো এ পুণ্য ক্ষেত্রে, খুঁজিছে অযুতনেত্রে
কোথায় ভারত-বন্ধু
রহিয়াছ ঘুমি! ১

এ জগৎ—এ পান্থ-আবাসে,
কত কা'রা এসে চলে যায়,
কিন্তু (ভাগ্যে পৃথিবীর, মহাপ্রাণ, মহাবীর)
তোমা হেন নররত্ন
ক'টি শোভা পায়? ২

এত জন আছেতো ধরায়,
কেবা দীন ভারতের লাগি
বিকায় আপন প্রাণ, কেবা করে আত্মদান,
দিন রাত, তপস্যায়
জাগরণে জাগি? ৩

অভাগিনী বঙ্গভূমি-কোলে,
"মা" বলি আসিলে তুমি যবে,
সে দিন সে বক্ষ দিয়া, সুধা গেল উছলিয়া!
আর কি তেমন দিন
এ জনমে হ'বে? ৪

সাধে তব স্মৃতি-পূজা করে
ভারতের দীন নারী নর?
তারা যে ও মহামন্ত্রে, পেয়েছিল বিনা যন্ত্রে,
সাধিয়া দিলেন বিধি
পরশ-পাথর! ৫

তোমারি ও স্বর্গীয় আলোকে
ভারতের কতই নন্দন,
ভাঙি অন্ধভুল ভ্রান্তি, পেলে সত্য সুখশান্তি,
লভিলা অবলা-কুল
নবীন জীবন! ৬

জীবনের বিশ্বাসী সুহৃদ্,
তোমা সম কে তাদের আর?
স্নেহে পিতা, যত্নে ভাই, উপদেশে গুরু—তাই
তোমার সে স্নেহ-ঋণ
অশোধ্য—অপার! ৭

আজি তুমি রয়েছ যেখানে,
স্তুতি-নিন্দা-অতীত সে স্থান,
তবে এ মরত ধামে, মোরা ও পবিত্র নামে
আত্মতৃপ্তি আশে করি,
তব লীলা গান! ৮

কিন্তু—
ভাষার শকতি নাহি কভু,
প্রকাশিবে, দেব! তব গুণ,
হেন মনে সাধ করি, কনক মূরতি গড়ি,
জননীর কোলে দেখি
সোণার বেগুন! ৯

হায় রে, দরিদ্র দীন মোরা!
সে সাধ পুরাতে নাহি পারি,
তবে আজি তোমা স্মরি, প্রীতির তর্পণ করি,
হৃদয়ের শ্রদ্ধা দিয়ে
আর অশ্রুবারি! ১০

তুমি দেব! কর আশীর্ব্বাদ
ভারতনিবাসী সবাকার,
হোক্ লাভ মনুষ্যত্ব, শিখুক তোমার তত্ব,
তব সেই "আত্ম-দান"
যেন হয় সার!
অই স্বর্গপুরী থেকে তৃপ্ত হও দেখে দেখে
এ ভারত, প্রাণে অনুপ্রাণিত তোমার! ১১

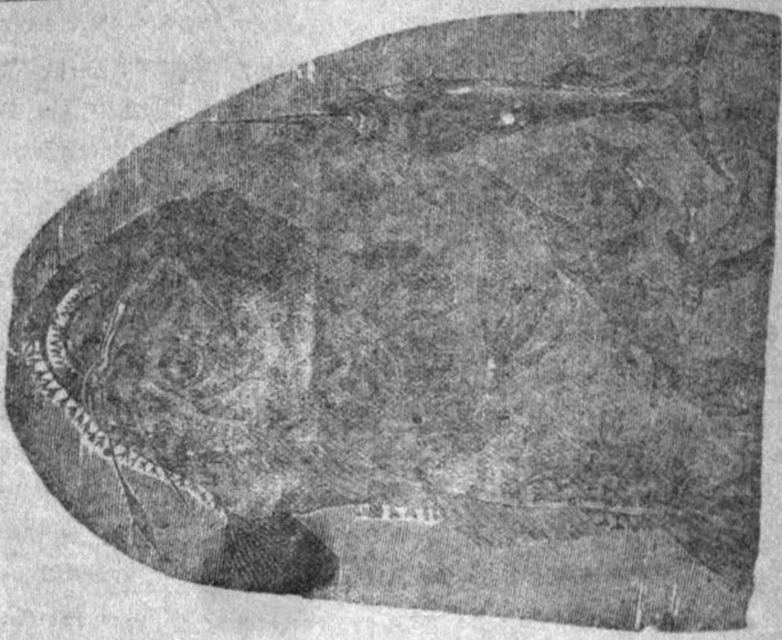
লেখিকা—বঙ্গবাসিনী।

মৎস্য।

মৎস্য মনুষ্যের আহারীয়, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর নিকট ইহা অধিকতর উপাদেয় ও প্রয়োজনীয়। অন্যান্য জাতি মৎস্যের সঙ্গে মাংস আহার করিয়া থাকেন, কিন্তু বাঙ্গালীদের উভয় মৎস্য মাংসের কার্য্য মৎস্য দ্বারা হইয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, ধান্যের আবাদ আমাদের কাছে যত প্রয়োজনীয়, গো-জাতি প্রতিপালন যত প্রয়োজনীয়, মৎস্য-দিগের রক্ষণাবেক্ষণও প্রায় তদ্রূপ। বিশেষতঃ এই আহারীয় পদার্থ সংগ্রহ করিতে কেবল ধরিবার যত্ন ব্যতীত আর কোন পরিশ্রম করিতে হয় না।

আমাদের দেশে পুষ্করিণীতে মৎস্য পোষিত হইয়া থাকে। কিন্তু মাছ ছাড়িয়া দেওয়া সম্বন্ধে অনেকে কয়েকটী অবি-বেচনার কার্য্য করেন। প্রায় সকল মৎস্যই রাক্ষস, বিশেষতঃ কয়েক প্রকার মৎস্য আছে, তাহাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই।

এই সমুদায় মাছ পুকুরে থাকিলে অন্যান্য মৎস্যের সেখানে থাকা দুষ্কর হয়। মৎস্যের মধ্যে গজাড় ও বোয়াইল মৎস্যের ন্যায় পেটুক আর কেহ নাই। যে পুকুরে গজাড় আছে, সেখানে আর কোন মীন-বংশের বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। বোয়াইল মাছ এরূপ ক্ষুধার্ত্ত ও পেটুক যে, যে



পুকুরে ঢোঁড়া সাপ থাকে, সেখানে লোকে বোয়াইল মাছ ছাড়িয়া দেয়। বোয়াইল মাছ এত বৃহৎ হয় যে, কথিত আছে যে, উহারা মনুষ্য পর্য্যন্ত ধরিয়া আহার করে। গজাড় মাছ জলে এত দ্রুতবেগে গমন করে যে, তীরের গতির সহিত উহার গতির তুলনা করা যাইতে পারে। উহারা এরূপ উগ্র যে, কখন কখন মনুষ্যকেও আক্রমণ করে। বন্য পশুর মধ্যে যেমন ব্যাঘ্র, দেশীয় মৎস্যের মধ্যে সেইরূপ গজাড়।

অনেকে সাধ করিয়া পুঁটি মাছ ও ফলুই মাছ এক পুকুরে ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু তাহাদের জানা উচিত যে, পুঁটি মাছের যম ফলুই। ফলুইও অত্যন্ত উগ্র। উহারা জলের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাসা বান্ধিয়া ডিম্ব প্রসব করে; উহার নিকট যে কোন মৎস্য যায়, তাহাকে আক্রমণ করে। এমন কি মনুষ্যকেও আক্রমণ করিতে ভয় করে না। চিতল মাছ ফলুইয়ের বড় ভাই। কিন্তু অনেকে না বুঝিয়া পুকুরে চিতল মাছ ছাড়িয়া দিয়া থাকেন।

পুষ্করিণীতে মৌরলা মাছ অতি সত্বর পরিবর্দ্ধিত হয়; কিন্তু লাঠা, শোইল, চেঙ ইহাদের পরম শত্রু, অথচ এমন পুকুর নাই যেখানে ইহারা সকলে একত্র বাস না করে। গজাড়ের ছোট ভাই চেঙ্গ আর শোইল। ইহার মধ্যে এক জাতি চেঙ্গ এরূপ লোভী ও নির্লজ্জ যে,

বঁড়শীতে মুখ ছিঁড়িয়া গেলেও পুনরায় বঁড়শী ধরে। ইহাদিগকে সচরাচর গেছো চেঙ্গ বা তেলো চেঙ্গ বলে।

পুষ্করিণীতে সকল মৎস্যেরই ডিম্ব হয়, কিন্তু ছানা হয় না। ল্যাঠা, পুঁটি, মোরলা ফলুই, বেলে, চেলা ও কখন কখন শোইল মৎস্য ব্যতীত আর কোন মৎস্যের ছানা হয় না। বৃষ্টি হইলে যে পুষ্করিণীতে স্রোত না যায়, সেখানে মৌরলা চেলা ব্যতীত প্রায় আর কোন মৎস্যের বংশবৃদ্ধি হয় না।

নূতন পুষ্করিণী খনন করিয়া সেখানে রোহিত প্রভৃতি মৎস্য ছাড়িয়া দিলে আপনা আপনি চিঙ্গিড়ী মৎস্যের সৃষ্টি হয়। ইহাই ঐ সমুদায় মৎস্যের আহার। অতএব রোহিত প্রভৃতির আহারের নিমিত্ত অন্যান্য ক্ষুদ্র মৎস্য ছাড়িয়া দিবার প্রয়োজন হয় না। এক পুষ্করিণীতে বড় মৎস্যের মধ্যে রোহিত, কাতলা, মৃগেল, কালবৌউস, বাটা, এবং ছোট মৎস্যের মধ্যে মৌরলা, চেলা, পুঁটি, ও বেলে পোষা যাইতে পারে। যদি পুকুরে ল্যাঠা মাছ থাকে, তবে তাহারা রোহিতের পোনা ভক্ষণ করিয়া ফেলে। যদি চিতল মাছ পুষিবার ইচ্ছা থাকে, পৃথক্ পুকুরে ছাড়িয়া দিলে হইতে পারে, তবে ল্যাঠা, শোইল গজাড় প্রভৃতি মৎস্য এরূপ আস্বাদশূন্য যে, তাহাদিগকে পুষিবার প্রয়োজন নাই।

আমাদের দেশে মৎস্য ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। কোন কোন মৎস্য লুপ্তপ্রায়। ভেল্‌সা, বাটক প্রভৃতি মৎস্য আর এইক্ষণে পাওয়া যায় না। এইরূপ সকল মৎস্যই কমিয়াছে। হঠাৎ ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া উঠা যায় না। ক্রমে দেশ উচ্চ হইতেছে ; ইহা যে একটি কারণ তাহার সন্দেহ নাই। আর এক কারণ অযত্ন। ক্রমে যে দেশ উচ্চ হইতেছে, তাহা নিবারণ করিবার যো নাই। যেমন স্থলভাগ বৃদ্ধি হইতেছে, অমনি পুষ্করিণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে হইতে পারে। এই ক্ষণে যেরূপ লোকের মতি গতি হইতেছে, তাহাতে পুষ্করিণীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, যে সকল পুরাতন পুকুর মজিয়া গিয়াছে, তাহাদের পঙ্কোদ্ধারই হইতেছে না।

মৎস্যের প্রতি আমাদের কিরূপ অযত্ন, তাহা দেখাইতেছি। মৎস্যের ছানা নষ্ট করিতে এদেশীয়দের কিছুমাত্র মমতা নাই। যে সমুদায় মৎস্যের পোনা ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমণ করে, তাহারা এরূপ অসহায় ও উপায়হীন যে অনায়াসে তাহাদিগকে ধরা যায়। কিন্তু এ সকল মাছ ধরাতে বিশেষ লাভ নাই, কারণ উহারা আস্বাদশূন্য। প্রবাদই আছে "মাছের মা, শাকের ছা" ভাল। কিন্তু তবু রাশি রাশি খয়রার ছানা, গজাড় শোইল ও ল্যাঠার ছানা, পুঁটি, মৌরলা ও চেলার ছানা ধরা হইয়া থাকে। অনেক মৎস্য আবার তাহাদিগের ছানার ঝাঁকের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায় বা ডিম প্রসব করিয়া উহা রক্ষণাবেক্ষণ করে। এই সময়ে তাহারা অনায়াসে ধৃত হয়। এই সমুদায় মাছ

ধরা পড়িলে তাহাদিগের ছানাগুলি অসহায় হয় এবং তাহারা অতি সত্বর অন্যান্য মাছ কর্ত্তৃক গ্রাসিত হয়।

শীতপ্রধান দেশে মাছ যেরূপ অনায়াসে অনেক কাল রাখা যায়, আমাদের দেশের জলবায়ুর দোষে তাহা পারা যায় না। উহা অবিলম্বে পচিয়া উঠে। ইলিশ মৎস্য লোনা করিয়া দুই এক মাস রাখা যায়। কোন কোন মাছ শুক্‌টী করিয়া কিছু কাল রাখা যায় বটে, কিন্তু উহা ভদ্র লোকে আহার করেন না। কোন কোন মৎস্যকে কিছুকাল জলে জীবিত রাখা যায়। সিঙ্গি মৎস্য সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন-জীবী। ইহার নীচে কই, ও কইয়ের নীচে মাগুর; কিন্তু জিয়াইয়া রাখিলে মৎস্য এরূপ বিস্বাদ হইয়া যায় যে, উহা রাখা না রাখা তুল্য হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত অধিক পরিমাণে মৎস্য ধরা পড়িলে অনেক নষ্ট হইয়া যায়।

যখন জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ভারি বৃষ্টি হয়, তখন অল্প স্রোত বহিয়া অনেক মৎস্য জলাশয় বা পুকুর হইতে উঠিতে থাকে, আবার কার্ত্তিক মাসে উহারা এক পসলা ভারি বৃষ্টি পাইয়া প্রত্যাগমন করে। প্রত্যাগমনের সময় অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে এ দেশে মাছ খাইতে নিষেধ আছে। প্রায় সকল মৎস্যই উঠিয়া ও নামিয়া থাকে। এই কালে ইহারা অনায়াসে ধৃত হয়, এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণে ধৃত হওয়ায় লোকে রাশি রাশি মৎস্য আহার করিয়া পীড়িত হয় ও পরিশেষে ফেলিয়া দেয়। কিন্তু এ দেশের লোকদের স্বভাব, মৎস্য দেখিলে প্রয়োজন থাকুক আর না থাকুক ধরিতেই হইবে।

এইরূপে আষাঢ় মাসে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ মৎস্য গভীর জল কিম্বা সমুদ্র হইতে নদীতে প্রবেশ করে ও স্রোতের বিপরীত দিকে গমন করিতে থাকে। এরূপ গমনের উদ্দেশ্য ডিম্ব প্রসব করা। তখন অসংখ্য পরিমাণে মৎস্য ধৃত হয়, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই মৎস্য লোনা করিয়া রাখা যায়। কার্ত্তিক মাসে ভারি এক পসলা বৃষ্টি হইলে রোহিত, মৃগেল ও কাতলার পোনা স্রোতের বিপরীত দিকে একেবারে দিগ্‌ বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া গমন করিতে থাকে। এইরূপে এত মৎস্য গমন করিতে থাকে যে, নদীর মধ্য দিয়া যদিও তাহারা স্থিরভাবে যায়, তথাপি নদীর তীর হইতে তাহাদিগের গমনের শব্দ শুনা যায়। তখন তাহারা একবারে অজ্ঞান হয়—মনুষ্যকে পর্য্যন্ত কিছুমাত্র ভয় করে না, যে কোন বাধা সম্মুখে পড়ে, তাহা অতিক্রম করিবার নিমিত্ত লম্ফ দিতে থাকে। সে শোভা দেখিতে অতি অপূর্ব্ব। তখন যে কত মৎস্য ধরা পড়ে, তাহা অগণনীয়। এই সমুদায় ক্ষুদ্র মৎস্যের আস্বাদ মাত্র নাই। যখন এইরূপ মৎস্য ধৃত হইতে থাকে, তখন ধীবরেরা উহা বিক্রয় করিতে না পারিয়া শতশত মৎস্য বিতরণ করিতে থাকে, ও গন্ধের ভয়ে এই মৎস্য গাড়ী বোঝাই করিয়া লোকে দূরে নিক্ষেপ করে।

কোন কোন প্রাজ্ঞ কৃষক ইহা দ্বারা ভূমিতে সার দেয়।

পদ্মা প্রভৃতি বড় বড় নদীতে জেলেরা বড় বড় জাল দিয়া মৎস্য ধরিয়া থাকে। ইহাতে তাহারা এত মৎস্য পায় যে, ক্রেতা মিলে না। ইলিশ মৎস্য লোনা করিয়া ফেলে, কিন্তু অন্যান্য মৎস্য বিক্রয় করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে (কখন কখন রাশি রাশি মৎস্য এইরূপে উদ্বৃত্ত হয়), তাহা ফেলিয়া দেয়। এইরূপে বৎসর বৎসর প্রয়োজনের অতিরিক্ত মৎস্য ধৃত হওয়াতে অস্মদ্দেশে মৎস্যকুল ক্রমে কমিয়া আসিতেছে ও অনেক মৎস্য পূর্ব্বাপেক্ষা আস্বাদহীন হইতেছে। পূর্ব্বে ইলিশ মৎস্যের যেরূপ আস্বাদ ছিল, এখন আর সেরূপ নাই।

বঙ্গবাসিগণ যে সকল মৎস্য আহার করেন, তাহা সচরাচর তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে; যথা—সমুদ্রের মৎস্য, নদীর মৎস্য ও পুকুরের মৎস্য।

সমুদ্রের মৎস্য—ভেটকী,পায়সে,খড়েল।

নদীর মৎস্য—বোয়াল,পাপ্‌তা, পাঙ্গাস, ধাই, পাপ্‌তা টেঙরা, পাপ্‌তা বাচা, চেতল, ফলুই, ইলসা, ফাঁদা, চেলা, খয়রা, খরসুলা, তপসা, ভোলা, রোহিত, কাতলা, কালবোশ, মৃগেল, গল্‌দা চিঙ্গড়ী, ইত্যাদি।

পুষ্করিণীর মৎস্য—মাগুর, সিঙ্গি, চেলা, পুঁটী, বাটা, কই, খলসে, চাঁদা, বেলে, বাইন, পাঁকাল, চিঙ্গড়ী, ইত্যাদি।

পদ্মা, চন্দনা, মধুমতী এবং কুমার নদীতে বৎসর বৎসর অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে মৎস্য ধৃত হইয়া থাকে।

মৎস্য ধরিবার উপায়—যথা—হাতে ধরা, ছিপ সূতা, হাতসূতা, বড়শী, বরশা, পোলো, হোচা, খাদন, খাপ, আরিন্দে, চারা, বাভানী, টুবা, দোয়ার, বোচনে, ঘুনশী, পায়না, চাই, নই, ফাঁশী, বাদ, জাল, মইজাল, কোণাজাল, বেড়াজাল, ছাঁদীজাল, দোড়া ছাঁদী, খেপলা জাল, খাড়া জাল, ভেশালজাল, ধর্ম্মজাল, সাঙ্গা-জাল, খোড়কাঁজাল, চাকজাল, চাপজাল, হোচাজাল, শোভাজাল ইত্যাদি।

পাঠিকাদিগের বিদিতার্থ এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ বারান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। শ্রীন।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

(৩৭৮ সংখ্যা—৮৭ পৃষ্ঠার পর)

চা, পথ্য ও যুষড়া প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

চা।

আজ কাল আমাদিগের দেশে সর্ব্বত্র সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে চা'র বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। চা-পানের কয়েকটী গুণ আছে। ইহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি

হয়; ইহা রক্ত-পরিষ্কারক, শরীরের অবসন্নতা ও জড়তা নাশক; এবং সর্দ্দি কাশি ও ম্যালেরিয়া রোগে ইহার বিশেষ উপকারিতা লক্ষিত হয়।

একজনের পান করিবার মত চা প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমতঃ চারি আনা ওজনের চা একটী শুষ্ক, পরিষ্কার, ও মুখের ঢাকাবিশিষ্ট পাত্রে রাখিয়া তাহাতে এক পোয়া অত্যুষ্ণ পানীয় জল নিক্ষেপ করতঃ পাঁচ মিনিট কাল পাত্রটীর মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, তৎপরে উহা অপর একটী পাত্রে ছাঁকিয়া লইয়া, কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া, ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে পান করিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে চা প্রস্তুত করিবার পর, সিদ্ধ চা-পত্রগুলি যে পরিমাণে উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ ও সদ্গন্ধযুক্ত হইবে, সেই পরিমাণে চা উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ হইবে। আর উক্ত সিদ্ধ পত্রগুলি যদি হরিদ্বর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, কিম্বা হরিৎ ও ধূসরবর্ণ মিশ্রিত, অথবা ধোঁয়াটে বা চোঁয়া গন্ধযুক্ত হয়, তাহা হইলে চার অপকৃষ্টতা বুঝিতে হইবে।

পথ্য—সাগু।

উত্তম সাগু এক তোলা আড়াই পোয়া জলে দুই ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিবে, পরে ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত অগ্নি সন্তাপে ফুটাইয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিলে সাগু প্রস্তুত হইবে। রোগীর ইচ্ছা বা তাহার পীড়ার অবস্থানুসারে ইহাতে চিনি, লেবুর রস ও লবণ মিশ্রিত করা যাইতে পারে। রোগীর পরিপাকশক্তি ও কোষ্ঠ বিবেচনা করিয়া ইহাতে দুগ্ধ মিশ্রিত করা বা দুগ্ধ সহ ইহা পাক করা যাইতে পারে।

এরারুট।

উত্তম এরারুট এক তোলার কম জলে মিশ্রিত করিবে। পরে ।৴০ বা ৷৴০ ছটাক ফুটিত জল উহাতে ক্রমে ক্রমে নিক্ষেপ করিবে এবং ঐ সময় উহা উত্তমরূপে আলোড়ন করিবে। পাত্রস্থ এরারুট অগ্নিতে চড়াইয়া ৩।৪ মিনিট কাল আবর্ত্তন করিলে এরারুট প্রস্তুত হইবে। তৎপরে নামাইয়া আবশ্যক মত লবণ, লেবুর রস বা চিনি মিশ্রিত করিবে। পরিপাকশক্তি ও কোষ্ঠ বিবেচনা করিয়া উপরি-উক্ত প্রকারে জলের সহিত প্রয়োজন মত দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া এরারুট প্রস্তুত করা যায়।

তণ্ডুলের অথবা যবের মণ্ড।

চাউল অথবা যবের তণ্ডুল ৴০ ছটাক, জল ৴১ সের উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া সিক্থ (সিটে) রহিত করিয়া ছাঁকিয়া লইলেই মণ্ড প্রস্তুত হয়।

খইয়ের মণ্ড।

খই উষ্ণ জলে ফেলিয়া ছাঁকিয়া সাফ করিয়া লইলেই হয়।

ব্যানানা ফ্লোয়ার বা কদলীচূর্ণ।

শ্রীযুক্ত বাবু নকুড় চন্দ্র বসাক, ঠিকানা কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীট, ৬৯ নং বাটী। ইনি ব্যানানা ফ্লোয়ার, বা কদলী-চূর্ণ নামে এক প্রকার ময়দা উত্তম জাতীয় কদলী হইতে প্রস্তুত করিয়া বহুদিন যাবৎ রোগীর পথ্য স্বরূপ ব্যবহার করিতেছেন। মূল্য এক

কৌটা চারি আনা মাত্র। নূতন রাসায়নিক প্রক্রিয়া বলে ইহার তিক্ত ও অজীর্ণ পদার্থ সকল যত্নপুর্ব্বক বিভিন্ন করা হয়। ইহা লঘুপাক এবং এরারুট, সাগুদানা, ও বার্লি পাউডার অপেক্ষা খাইতে সুস্বাদ ও পুষ্টিকর। যে যে পীড়ায় চিকিৎসকেরা এরারুট, সাগুদানা ও বার্লি ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, সেই সেই পীড়ায় ইহার উপকারিতা কোন প্রকারে ন্যূন নহে। বিশেষতঃ উদরাময়, রক্তামাশয়, ও অজীর্ণ রোগে ইহা একমাত্র পথ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুর্ব্বল ব্যক্তিরা শরীরের সুস্থতা ও কান্তি লাভের নিমিত্ত ইহা গরম দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া ও তাহাতে কিঞ্চিৎ উত্তম চিনি বা মিশ্রী প্রক্ষেপ করিয়া ব্যবহার করিতে পারেন। অনেক আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ বৈদ্য, ডাক্তার, হাকিম ও অপরাপর ভদ্রলোকেরা ইহার ব্যবহারে প্রীত হইয়া অনেক প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছেন।

ব্যবহারের নিয়ম।

একটী মৃন্ময় বা কলাই-করা লৌহ পাত্রে অর্দ্ধসের পানীয় জলের সহিত অর্দ্ধ কাচ্চা পরিমাণে কদলীচূর্ণ ১৫ মিনিট কাল মৃদু আঁচে সুসিদ্ধ করিয়া অবশেষে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও চিনি মিশাইয়া সেবনীয়। যাঁহাদের পীড়ায় দুগ্ধ নিষিদ্ধ, তাঁহারা কেবল পানীয় জলে পাক করিয়া কিঞ্চিৎ চিনি সংযোগপূর্ব্বক ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেহ কেহ কিঞ্চিৎ লেবুর রস দিয়া সদ্যাম্লযুক্ত করিয়া লন।

মাংসের যুষ।

ইহা ছাগ, মেষ, কপোত, কুক্কুট কিম্বা তিত্তিরী প্রভৃতির মাংসে প্রস্তুত হয়। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে।০ পোয়া বা ততোধিক মাংস অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ১।০ বা ১৷৷০ ঘণ্টা কাল দেড় সের বা আবশ্যক মত জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে উহাতে অল্প লবণ, হরিদ্রা, অকুঞ্চিত ধন্যা দিয়া আচ্ছাদিত পাত্রে, মৃদু অগ্নি সন্তাপে ফুটাইবে। অর্দ্ধসের আন্দাজ থাকিতে নামাইয়া একটী মৃত্তিকা, পাথর বা কাঁচপাত্রে ঝোল ও অপর একটী পাত্রে মাংস রাখিবে, তৎপরে মাংস চটকাইয়া ক্বাথ বাহির করিবে, এবং সেই ক্বাথ ঝোল সহ মিশাইবে। খানিক পরে সরু ন্যাকড়া দিয়া ভাসমান চর্ব্বি উঠাইয়া লইবে। রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া এক কড়ি প্রমাণ বা আবশ্যক মত ঘৃত, খান দুই তেজপত্র, অল্প মৌরি সহ সম্বরিয়া গোলমরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিবে। সামান্যতঃ যুষ ৬।৭ ঘণ্টা উত্তম থাকে। তৎপরে উহার আবশ্যক হইলে নূতন প্রস্তুত করিয়া দেওয়া প্রয়োজনীয়।

মানমণ্ড।

সচরাচর দুইভাগ শুষ্ক মানের গুঁড়া ও এক ভাগ চাউলের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া এই মিশ্রিত দ্রব্য ১৬ গুণ জলে পাক করিলে মানমণ্ড প্রস্তুত হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে কিম্বা অপর কোন প্রয়োজন হইলে তিন ভাগ মানচূর্ণ ও এক ভাগ চাউলের গুঁড়া দেওয়া যায়।

সূজির রুটী।

আবশ্যক মত সূজি এক ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে অর্দ্ধ কোয়াটার কাল উত্তম রূপে মাখিয়া একটী পিণ্ডাকার ডেলা করিবে। অনন্তর একটী পাত্রে জল অগ্নিতে চড়াইবে। যখন জল ফুটিবে, তখন সেই সুজির ডেলাটী তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। এক কোয়াটার কাল সিদ্ধ হইলে নামাইয়া সেই ডেলাটী উত্তম রূপে চট্‌কাইয়া খুব পাতলা এবং ছোট ছোট রুটী করিবে। রুটীগুলি যাহাতে বেশ ফুলে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

ঘুষ্‌ড়া প্রস্তুত প্রণালী।

ক্ষেত পাপ্‌ড়া, শিউলী পাতা, গুলঞ্চ, এই তিনটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া শিলে থেঁতো করিবে। পরে উহা একখানি কলাপাতে বা পান-পত্রে বান্ধিয়া চাটুতে সেঁকিয়া সমস্ত রাত্রি শিশিরে রাখিবে। পরদিন প্রাতঃকালে নিংড়াইয়া ইহা হইতে প্রয়োজন মত রস বাহির করিয়া লইবে। ইহাকেই ঘুষ্‌ড়া কহে। ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত উহারই রসে ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে।

জেনোবিয়া।

সিরিয়া দেশ যে সকল রমণীরত্ন প্রসব করিয়া ধন্য হইয়াছেন, সেপ্টিমিয়া জেনোবিয়া তন্মধ্যে একজন। ইনি স্বীয় রূপলাবণ্য, মধুর কণ্ঠস্বর, বিবিধ মানসিক সদ্‌গুণ, নানা ভাষা ও নানা শাস্ত্রে পারদর্শিতা দ্বারা যে কেবল সমসাময়িক গুণগ্রাহী জনসমাজ কর্ত্তৃক সংপূজিতা হইয়াছিলেন, এমন নহে; পরন্তু স্বীয় অতুল শৌর্য্যবীর্য্য, স্ত্রীজনোচিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও শুদ্ধাচারিতার জন্ত তদানীন্তন ও তদ্দেশীয় রমণীবৃন্দের শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন। গিবন ইহাঁর বিষয় লিখিতে গিয়া এক স্থলে বলিয়াছেন, "Her manly understanding was strengthened and adorned by study." জেনোবিয়া স্বভাবতই পুরুষোচিত বিবিধ গুণগ্রামে বিভূষিত ছিলেন। তথাপি ইনি যে পুরুষের ন্যায় তীক্ষ্ণ মেধা, অটল প্রতিজ্ঞা ও অবিচলিত বিচারশক্তির সম্যক্ অধিকারিণী হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বিবিধ শাস্ত্র ও বিবিধ ভাষা অনুশীলনের ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। মনুষ্যের বীজ নর নারী উভয়ের মধ্যেই সমভাবে নিহিত আছে। উৎকর্ষ বা অপকর্ষ, অনুশীলনের তারতম্যানুসারে সংঘটিত হইয়া থাকে। জেনোবিয়া তাহার একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। ইহাঁর পুরুষোচিত ধীশক্তি অনুশীলন দ্বারা সুদৃঢ় এবং সমলঙ্কৃত হইয়াছিল। জেনোবিয়া লাটিন, গ্রীক, সিরিয় ও মিশরদেশীয় ভাষাতে সুপণ্ডিতা ছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে "মিশরের ইতিহাস" ইহাঁর অক্ষয়